বিশ্বজয়ী স্বামীজির স্বদেশে প্রত্যাবর্তন,

নবযুগের আলোকে



ডাঃ জে. সি পাল
ভাষান্তর — শ্রীমতী মাধবী চক্রবর্ত্তী
বি.এস.সি (সা)

বিশ্ববিজয়ী স্বামীজির স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

নবযুগের আলোকে

ডঃ জে. সি. পাল

ভাষান্তর—

শ্রীমতী মাধবী চক্রবর্তী, বি.এস.সি. (অনার্স)

এই বইটি শ্রীমতি হাসি পালের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

উৎসর্গ করা হল

বিশ্ববিজয়ী স্বামীজির স্বদেশে প্রত্যাবর্তন

নবযুগের আলোকে

ড: জে. সি. পাল

প্রকাশক : ডা: পিনাকী চক্রবর্তী

প্রথম সংস্করণ : জুন ২০১৭

মুদ্রণ : প্রদীপ মজুমদার
১৯৭/১ প্রামানিক ঘাট রোড
কোলকাতা - ৭০০ ০৩৬
মোবাইল : ৯৪৭৭৪৪৬৭৯১

মূল্য : তিরিশ টাকা মাত্র

ভূমিকা

মহাকালের যাত্রাপথে বিশ্বপথিক আমরা। আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ চেতনা বুদ্ধি ও মনন নিয়ে যাত্রা করে চলেছি এক অজানা উৎস হতে আর এক অজানা পরিণতির দিকে। কিন্তু এই দিশাহীন অনন্তপথে যাত্রাকালে আমরা পথভ্রষ্ট হই নি। অনাদি অনন্তকাল ধরে মানবসভ্যতা এগিয়ে চলেছে। কখনও কখনও হয়তো অন্যায্য ধ্বংসলীলায় মানবসভ্যতার গরিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তা বিলীন হয় নি। যে সমস্ত মনীষী ও মহামানব বারংবার তাঁদের মেধার উৎকর্ষ ও হৃদয়ের ঐশ্বর্য্য দিয়ে আমাদের পথ দেখিয়েছেন, আলোর সন্ধান দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও মানবেতিহাসে তাঁর যাত্রাপথকে পুনর্বার অবলোকন করার জন্যই আমাদের এই সামান্য প্রচেষ্টা।

স্বামীজীর ভারত পরিভ্রমণ

1886 সালের 16ই আগস্ট ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির পর সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট হল যে তিনি জীবিতকালেই তাঁর শিষ্যদের আধ্যাত্মিকতার অর্ন্তনিহিত শক্তিতে জাগরিত করেছিলেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তাঁর প্রিয়শিষ্য নরেন বিশ্বব্যাপী মানবতাকে আশ্রয় দেবে অশ্বত্থ গাছের মত। শুধুমাত্র নিজমুক্তির পথ অনুসন্ধানের জন্য নরেন সঙ্কল্পবদ্ধ হবে না, সে কাজ করবে সর্বমুক্তির জন্য, সমস্ত মানবসভ্যতাকে আলোকিত করার জন্য। সে এক সন্ন্যাসী সংঘ প্রতিষ্ঠা করবে, যা কিনা তার গুরুদেবের কথামৃতকে সর্বসাধারণের সামনে নিয়ে আসবে, সমৃদ্ধ করবে মানুষের অর্ন্তনিহিত মনুষ্যত্বকে। নরেনের এই ঈশ্বর নির্দেশিত কর্মপন্থা ও ঐশ্বরিক অনুভূতি এক সর্বজনগ্রাহ্য বাণী হয়ে শুধুমাত্র ভারত নয়, সমগ্রবিশ্বমানব সমাজকে উপকৃত করবে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধির কয়েক মাসের মধ্যেই, 19 শে অক্টোবর 1886 সালে, বরানগর মঠ প্রতিষ্ঠিত হল। সেটি ছিল এক জীর্ণ পোড়ো বাড়ি, যেখানে ঠাকুরের তরুণ শিষ্যরা মিলিত হয়ে ত্যাগ, তিতিক্ষা, বৈরাগ্য ইত্যাদি সন্ন্যাসজীবনের মূলমন্ত্রের অণুশীলনে কালাতিপাত করতেন। এই মঠই ছিল পরবর্তীকালের শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রদর্শিত হিন্দুধর্মের মহিমা পুনঃপ্রতিষ্ঠাজনিত ধর্মান্দোলনের ভিত্তিস্বরূপ।

তরুণ নরেন ছিলেন এক ভ্রাম্যমান যাত্রী যিনি এক ভারতপথিক সন্ন্যাসীরূপে সমগ্র ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল ভ্রমণ করেছেন, যা কিনা সন্ন্যাসজীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

ভারতপথিক স্বামীজী এই সময়কালে তাঁর মাতৃভূমি ভারতকে খুব কাছ থেকে দেখার ও যাচাই করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তার আগেই স্বামীজী উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ শুধুমাত্র ঈশ্বরপ্রতিম ছিলেন না, তিনি ছিলেন ঈশ্বরকেন্দ্রিক। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ স্পষ্ট পথনির্দেশ দিয়েছিলেন কিভাবে ভারত তার গভীর আধ্যাত্মিক চেতনার গৌরবময় উত্তরাধিকার ফিরে পেতে পারে।

ঠাকুরের বিশ্বজনীনতা

স্বামীজীর গুরুদেব সবসময়েই প্রফুল্ল সদাহাস্যময় থাকতেন, তাঁর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্কে তাঁর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সর্বদাই সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হত এবং এখানেই তাঁর বিশ্বজনীতা স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হত। কিন্তু এ সব কিছুর মাঝে একমাত্র ঈশ্বরই ছিলেন তাঁর সমগ্র চেতনার কেন্দ্রবিন্দুতে।

ধর্ম সর্বপরিব্যাপক। কিন্তু ভারতভূমি ছিল বিবিধ পার্থিব ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। সেই কারণে স্মরণাতীত কাল থেকে বিদেশীরা বার বার এই পুণ্যভূমি লুঠ করেছে। তা সত্ত্বেও ভারতের সমগ্র ইতিহাস তার সংস্কৃতি এবং ধর্মকেন্দ্রিক। শুধুমাত্র ধর্ম এবং আধ্যাত্মিকতাই ভারত ইতিহাসে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে আছে সেই মহেঞ্জদারো সভ্যতাপূর্ব সময়কাল থেকেই।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিচ্ছবি

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবরাশির দ্বারা অণুপ্রাণিত রাজা

রামমোহন রায়ের একেশ্বরবাদী, মূর্তিপূজা বিরোধী, কুসংস্কার বিরোধী চিন্তাধারা ভারতে প্রকৃতপক্ষে প্রসারলাভ করে 1833 সালে সুদূর ইংলন্ডের ব্রিস্টলে তাঁর মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পরে, প্রায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে। বাংলার নবজাগরণের অন্যান্য পথপ্রদর্শকদের মধ্যে ছিলেন সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যিনি 1882 সালে। আনন্দমঠ উপন্যাস লিখেছিলেন এবং এই উপন্যাসের সন্তানদলের বন্দেমাতরম মন্ত্র ব্রিটিশ অধিকৃত বাংলার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়েছিল স্বাধীনতাকামী জনগণের মূলমন্ত্র হিসাবে। অন্যান্য নবজাগরণের পথিকৃৎ হিসাবে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং অবশ্যই স্বামী বিবেকানন্দ, যিনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মতাদর্শে দীক্ষিত। স্বামীজী বুঝেছিলেন যে জনসংখ্যার ভারে নুব্জ ভারত এক-গরিব দেশ, বিদেশী শক্তির পদানত এবং আভ্যন্তরীণ সামাজিক কুসংস্কার, দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং জাতিভেদের কু-প্রথায় জর্জরিত। তিনি তাঁর গভীর অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন যে ইওরোপীয় সমাজের অনেক অগ্রগতি হয়েছে শিল্পবিপ্লব, উনবিংশ শতাব্দীর ইওরোপের নবজাগরণ এবং ফরাসী বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ডাকে।

সুদূর কন্যাকুমারীকায় স্বামীজীর ধ্যান

সুদর দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে স্বামীজীর এক গভীর মানসিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের দক্ষিণ প্রান্তসীমায় তিনটি মহাসাগরের সন্ধিস্থলে অধুনা বিবেকানন্দশিলা হিসাবে খ্যাত ক্ষুদ্র শিলাময় ভূ-খন্ডে তিনি

এক বিপজ্জনক এবং শ্রমসাধ্য ধ্যানে নিমগ্ন হয়েছিলেন তাঁর আত্মচেতনাকে উপলব্ধি করার জন্য। সেই স্থানটি তাৎপর্য্যগতভাবে ভারত মহাসাগর, আরব সাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের মিলনস্থল। স্বামীজী তাঁর গভীর অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে বুঝেছিলেন যে ভারতের অর্ন্তগত সমস্ত জনসমষ্টি বিবিধ ধর্ম, জাতি, ভাষা, ঐতিহ্য, আচার ব্যবহারের অপূর্ব মিশ্রণ। সেই ঐতিহ্যমন্ডিত জনসমষ্টি আজ পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে এসেছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক ও শিক্ষাগত সংস্কারের স্পর্শে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যে সূত্রপাত সেদিন তিনি দেখেছিলেন, তাকে ভারতের স্বতঃস্ফূর্ত আধ্যাত্মিক গরিমার ভিত্তির উপর স্থাপন করে ভারতের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিগণকে এক গৌরবময় উন্নত সমাজচেতনায় মন্ডিত করার স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের তিন দিকপাল গান্ধীজী, নেহরুজী এবং নেতাজী তাঁর ভাবধারায় বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। চারিশত বৎসর পূর্বে কলম্বাস স্পেনদেশ থেকে আমেরিকায় এসেছিলেন, তারই স্মরণে ১৮৯৩ সালে শিকাগো শহরে ওয়ার্লড কলম্বিয়ান এক্সপোজিশন হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল স্থূলজগতে মানুষের উন্নতির নিদর্শনের একত্র সমাবেশ করা, পাশ্চাত্য কৃষ্টি এবং অনুন্নত দেশের সংস্কৃতির নিদর্শন ও প্রতীকাকারে গৃহীত হয়েছিল। এই কার্যধারার অন্তর্গত ছিল শিকাগোর সেই বিখ্যাত বিশ্বধর্মমহাসভা, যেখানে স্বামীজীর চূড়ান্ত সফল বক্তৃতা তাঁকে জগৎসমক্ষে পরিচিত করে দিয়েছিল।

বিশ্বধর্মমহাসভার যোগদানের অর্ন্তলীন ডাক

আমেরিকার শিকাগো শহরে বিশ্বধর্মমহাসভা অনুষ্ঠানের খবর স্বামীজীর দক্ষিণ ভারতীয় শিষ্যগণ বিশেষতঃ আলাসিঙ্গা পেরুমলের কাছে এসেছিল এবং তিনি স্বামীজীকে অনুরোধ করেছিলেন মহাসভায় যোগদানের জন্য। স্বামীজী নিজ অন্তরে ও সেই আহ্বান শুনেছিলেন। কারণ একসময় তিনি তাঁর গুরু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের থেকে ও আদেশ পেয়েছিলেন যে তাঁকে এক গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। তাই তিনি তাঁর গুরুমাতা শ্রীমা সারদাদেবীর কাছ থেকে অনুমতি ও আশীর্বাদ নিয়ে ১৮৯৩ সালের ৩১ শে মে শিকাগোর উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা করলেন এবং দু'মাস অবিরাম যাত্রাশেষে ১৮৯৩ এর ২৫ই জুলাই ভ্যাঙ্কুভারের ক্যানাডিয়ান পোর্ট সিটিতে অবতরণ করলেন। তারপর সেখান থেকে রেলযোগে ২৪ শে জুলাই শিকাগো শহরে পৌঁছেছিলেন, তাঁর সেই যাত্রাপথ ছিল ২০০০ মাইল ব্যাপী।

প্রাথমিক বাধা-বিপত্তি

যে প্রাথমিক বাধা স্বামীজীকে শিকাগোতে পদার্পণের পরে প্রতিহত করেছিল তা হল মহাসভার নিয়মাবলী সংক্রান্ত। কারণ তিনি জানতে পেরেছিলেন সঙ্গে উপযুক্ত পরিচয়পত্র না থাকলে তিনি সেখানে প্রতিনিধিরূপে অর্ন্তভুক্ত হতে পারবেন না, আর প্রতিনিধি হিসাবে অর্ন্তভুক্তির সময়ও উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কাজেই শিকাগোতে পৌঁছে তিনি ধর্মমহাসভায় যোগদানের ক্ষীণ আশাও দেখতে পাচ্ছিলেন না এবং মনে

করেছিলেন যে সুযোগটি তিনি হারালেন। কাজেই তিনি তাঁর পূর্বনির্ধারিত গন্তব্যপথ বদলে বস্টন যাওয়া মনস্থ করলেন। বস্টনের ম্যাসাচুসেটস্ শহরই তাঁর নতুন গন্তব্য হল, কারণ আমেরিকার চেয়ে বস্টনে ব্যয়বাহুল্য কম ছিল।

অপ্রত্যাশিত সুযোগ

বস্টনে থাকার সময়কালে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে প্রফেসর জন হেনরী রাইটের সঙ্গে পরিচিত হলেন। প্রফেসর রাইট ছিলেন গ্রীসের হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির একজন ফ্যাকাল্টি মেম্বার। প্রফেসর রাইট স্বামীজীর মেধা, গভীর জ্ঞান এবং বাগ্মিতায় এমনই অভিভূত হয়েছিলেন যে এক স্থানে তিনি বলেছিলেন, "স্বামীজীর কাছে পরিচয়পত্র চাওয়া আর সূর্যকে তার কিরণ-বিকিরণের ক্ষমতা আছে কিনা জিজ্ঞাসা করা একই কথা।" কাজেই একেবারে শেষ মুহূর্তে স্বামীজী এক পরিচয়পত্র পেলেন যেখানে প্রফেসর রাইট তত্ত্বাবধায়ক কমিটিকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন যে স্বামীজীর যে জ্ঞান ও মেধা আছে তা আমেরিকার সমস্ত অধ্যাপকদের সম্মিলিত জ্ঞানভান্ডারের চেয়েও বেশী।

শ্রীযুক্ত জর্জ ডব্লিউ হেল ও মেরি হেলের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত যোগাযোগ

কাজেই স্বামীজী শিকাগো শহরে ফিরে এলেন 9ই সেপ্টেম্বর, 1893 সালে, ধর্মমহাসভার প্রথম অধিবেশন শুরুর ঠিক 48 ঘন্টা আগে, প্রথম অধিবেশনের সময়কাল ছিল 11ই সেপ্টেম্বর, এবং সেটি ছিল এক সোমবার।

তিনি শিকাগো পৌঁছলেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত: মহাসভার অফিসের ঠিকানা লেখা কাগজের টুকরোটি তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন। সেটি ছিল জার্মাণ অধ্যুষিত শহরের উত্তর-পূর্বাঞ্চল। কাজেই তিনি ভাষাসমস্যার জন্য মহাসভার অফিসের ঠিকানা বা নিদেনপক্ষে কোন হোটেলের থাকার সংস্থানও করতে না পেরে হতোদ্যম হয়ে পথিমধ্যে বসে পড়লেন। সেই স্থানটি ছিল প্রফেসর জর্জ হেল এর বাড়ির সামনের রাস্তা এবং হঠাৎ হেলদের ধনী গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে মিসেস হেল বেরিয়ে এসে তাঁকে সাদর আহ্বান করে গৃহে নিয়ে গেলেন এবং প্রতিশ্রুতি দিলেন পরদিন তাঁকে ধর্ম মহাসভার অফিসে নিয়ে যাবেন।

মহাসভার প্রারম্ভিক অধিবেশন

1893 সালের 11ই সেপ্টেম্বর, সোমবার সকালে শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউটে মহাসভার অধিবেশন আরম্ভ হল। এই আর্ট ইনস্টিটিউট নির্মিত হয়েছিল 1892-93 সালে প্রাচীন পদ্ধতি এবং নবস্থাপত্যকলার সংমিশ্রণে। বিশ্বমেলা ক্ষেত্রে অস্থায়ীভাবে যে আর্ট প্যালেস নামে ভবন নির্মিত হয়েছিল, এটি ছিল তা থেকে ভিন্ন এবং এই আর্ট ইনস্টিটিউট ছিল মিশিগান অ্যাভিনিউর উপর।

আর্ট ইনস্টিটিউটের বৃহত্তম কক্ষে—'হল অব কলম্বাস'——এ ধর্মমহাসভার অধিবেশন হয়েছিল, যেখানে 4—5 হাজার লোকের স্থানসঙ্কুলান হত। চতুর্থ দিন থেকে শিল্প প্রদর্শনশালা সংলগ্ন ওয়াশিংটন হলটিও ধর্মমহাসভার কাজে ব্যবহৃত হতে

থাকল আরও কয়েক হাজার শ্রোতা ও দর্শকের স্থানসঙ্কুলান করার জন্য, যারা প্রথম তিন দিন স্থানাভাবে প্রবেশাধিকার পাননি। মহাসভার অধিবেশন চলেছিল 17 দিন ধর্মমহাসভার পঞ্চম দিনে বিজ্ঞান শাখার উদ্বোধন হয় এবং ধর্ম ও বিজ্ঞান বিষয়ক আরও অনেক ভাষণ সেখানে পাঠ করা হয়। মহাসভায় প্রদত্ত বক্তৃতা ছাড়াও স্বামীজী বিজ্ঞান শাখায় কমপক্ষে 4টি বক্তৃতা দেন। মহাসভার প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির মধ্যে 2 টি দেন 22 শে সেপ্টেম্বর, একটি 23 শে সেপ্টেম্বর এবং আর একটি দেন 25 শে সেপ্টেম্বর।

20 শে সেপ্টেম্বর স্বামীজী যে ভাষণটি দেন তার শিরোনাম ছিল— 'কেবলমাত্র ধর্মই ভারতের একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু নয়।' এই আলোচনাসভাটির সভাপতি ছিলেন বিশপ কেনে (Keane)। এ কথা অনস্বীকার্য যে স্বামীজী কেবলমাত্র হিন্দু ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বাণী প্রচার করেন নি। তিনি মহাসভায় সমবেত দর্শকদের ভারতের দারিদ্র্যপীড়িত, অবিচার ও শোষণে জর্জরিত নিম্নবর্গের মানুষের (Dahit Commnitus) অর্থনৈতিক মুক্তির বিষয়ে অবগত করেছিলেন। মহাসভা শেষ হয় 27 শে সেপ্টেম্বর, 1893 সালে। তারপর স্বামীজী ইংলন্ড এবং আমেরিকায় প্রায় সাড়ে তিন বছর ছিলেন। সেখানে তিনি হিন্দুধর্মের মূল ভাবধারা প্রচার করেন তাঁর বিদেশী অণুরাগী গণের দ্বারা আয়োজিত বিবিধ সম্মেলনে, বিশেষ করে লন্ডন এবং নিউ ইয়র্কে। তাঁর ছদ্মনাম হয়েছিল ঘূর্ণী সন্ন্যাসী।

তিনি বিদেশে তাঁর কয়েকজন অণুরাগী ভক্ত ও শিষ্যদের

কথা উল্লেখ করেছেন যাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মিস মার্গারেট নোবল্ (Later Known as sister Nivedita), ক্রিস্টিন গ্রিনস্টিডেন (Later Known as sister Christine), মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড, মিসেস ওলে বুল এবং সেভিয়ার দম্পতি, যাঁরা শেষ পর্যন্ত স্বামীজী প্রতিষ্ঠিত উত্তরাখন্ডের পিথোরাগড়ের মায়াবতী আশ্রমে পাকাপাকিভাবে বাস করেছিলেন। তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন মিস্টার গডউইন যিনি কেবলমাত্র তাঁর সাহায্যকারীই ছিলেন না, তিনি স্বামীজীর প্রদত্ত বক্তৃতা ও চিন্তাধারার শ্রুতি লেখক হিসাবেও কাজ করেছিলেন। গডউইনের এই সাহায্যের জন্যই তিনি 4টি গুরুত্বপূর্ণ মানবজীবনের পালনীয় শর্তাবলী সমন্বিত ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করতে পেরেছিলেন। সেগুলি হল—(ক) রাজ যোগ, (খ) জ্ঞান যোগ (গ) ভক্তি যোগ এবং (ঘ) কর্ম যোগ। বিদেশে ভারতীয় ও হিন্দু আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পর, তিনি ভারতে ফিরে যাওয়া মনস্থ করলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে সেভিয়ার দম্পতিকে নিয়ে 16ই ডিসেম্বর, 1896 সালে ইংলন্ড থেকে যাত্রা করলেন।

ফরাসী উপকূল পর্যন্ত তিনি স্টীমারে যাত্রা করলেন। ফ্রান্স থেকে তিনি ইটালীতে গেলেন। ইটালিতে রোমক সভ্যতার কীর্তিচিহ্নগুলি তিনি মনোযোগ সহকারে দেখলেন এবং এইভাবে মিলান, পিসা, রোম ভ্রমণ শেষ করে নেপলস্ এ উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে তিনি 30 শে ডিসেম্বর, 1896 সমুদ্র যাত্রা করেছিলেন। নেপলস থেকে তাঁদের জাহাজ ভূমধ্যসাগর অতিক্রমপূর্বক সুয়েজের পথে যাত্রা করল (Suez

Canal was excavatal by French Engineer Ferdinand Lesseps in 1870) জাহাজটি 15 জানুয়ারী স্বামীজীকে নিয়ে কলম্বো পৌঁছেছিল। অর্থাৎ স্বামীজীর এবারের সমুদ্র যাত্রা ছিল একপক্ষকালব্যাপী।

ধর্মমহাসভার বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না সেখানকার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ করা যায়। মহাসভায় স্বামীজীর স্বদেশবাসীর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অঙ্গারিক ধর্মপাল (Anagarik Dharmapal), যিনি তখনকার মহাবৌধি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং মহাসভায় বৌদ্ধধর্মের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। 14ই মে, 1894 সালে ধর্মপাল মহাশয়কে কলকাতার মিনার্ভা থিয়েটারে এক নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। যেখানে তিনি মহাসভায় স্বামীজীর অপূর্ব বাগ্মীতা ও সাফল্যের বিষয়ে কলকাতাবাসীকে অবগত করেছিলেন। পরবর্তীকালে ঋষি অরবিন্দ ও স্বামীজী সম্বন্ধে একই মতামত জানিয়েছিলেন।

ভারতভূমিতে 15ই জানুয়ারী, 1897 সালে স্বামীজীর পুনরাগমন

যে মুহূর্তে স্বামীজী লন্ডন ত্যাগ করে ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন, সেই মুহূর্ত থেকেই তাঁর অন্তঃকরণ নিবিষ্ট হয়ে ছিল ভারতের আর্থ-সামাজিক কাঠামোর পুর্ণবিন্যাসের চিন্তায়। লন্ডন ত্যাগের ঠিক পূর্বে সেখানকার একটি আলোচনাসভায় (সেমিনার) স্বামীজী একজন বিদেশী দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন যে এতকাল পাশ্চাত্য জীবনধারার সুখ

সুবিধা ও বিলাসে অভ্যস্ত স্বামীজী কি ভারতে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন না? এর উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন-"দেশ ছেড়ে আসার আগে আমি ভারতকে ভালবাসতাম; এখন ভারতের প্রতি ধূলিকণা পর্যন্ত আমার কাছে পবিত্র, ভারতের বায়ু পর্যন্ত পবিত্র; ভারত এখন পুণ্যভূমি- তীর্থক্ষেত্র।" যে মুহূর্তে তিনি কলম্বোর মাটি স্পর্শ করেছিলেন। তিনি যেন তাঁর মাতৃভূমি স্পর্শ করারই আনন্দ অনুভব করেছিলেন, কারণ তখনও কলম্বো ছিল ব্রিটিশ অধিকৃত ভারতীয় উপমহাদেশের অন্তর্গত।

কলম্বো নগরীতে স্বামীজীর প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সেখানকার স্থানীয় নাগরিক বৃন্দ এক সংবর্ধনা সমিতি গঠন করেছিল যাতে স্বামীজীকে এক সাদর অভ্যর্থনা দেওয়া যায়।

স্থানীয় সংবাদপত্রগুলি বিদেশ প্রত্যাগত বিজয়ী বীর সন্ন্যাসীর সংবাদ গভীর ও স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসের সঙ্গে পরিবেশন করেছিল। কলম্বোতে স্বামীজীর অভ্যর্থনা কমিটিতে স্থানীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মাবলম্বীই ছিলেন।

যখন স্বামীজীর জাহাজ কলম্বো বন্দর স্পর্শ করেছিল তখন অভ্যর্থনা কমিটির পক্ষ থেকে স্বামীজীর গুরুভ্রাতা স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও মিস্টার হ্যারিসন নামে জনৈক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী সাহেব জাহাজে উঠে স্বামীজীকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্‌কালে স্বামীজী জাহাজ থেকে নেমে একখানি লঞ্চে উঠলেন, যা তাঁকে তীরে নিয়ে এসেছিল। স্টীমার জেটি থেকে অভ্যর্থনা স্থান পর্যন্ত অর্থাৎ কলম্বোর অন্তর্গত বার্ণেস স্ট্রীট পর্যন্ত সমগ্র স্থানব্যাপী বিশাল জনমন্ডলীর তুমুল আনন্দোচ্ছ্বাস ও প্রীতিপ্রকাশের দৃশ্য সতত:ই হৃদয়গ্রাহী ছিল।

বার্নেস স্ট্রীটের প্রবেশ মুখে একটি সুদৃশ্য বিজয়তোরণ ও সভামন্ডপ নির্মাণ করা হয়েছিল। মাননীয় পি. কুমারস্বামী মহাশয় অগ্রসর হয়ে হিন্দুদের পক্ষ থেকে এক অভিনন্দনপত্র পাঠ করেছিলেন।

কলম্বোতে বসবাসকালে স্বামীজীর বক্তৃতাসমূহ

স্বামীজী কলম্বোতে নগরের প্রান্তে এক প্রসিদ্ধ দারুচিনি বাগানের অনতিদূরের একটি বাংলোতে কিছুদিন অবস্থান করেছিলেন। স্বামীজীর ঐ বাংলোতে অবস্থানকালে সেটি প্রকৃতপক্ষে একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল কারণ সমস্ত ধর্ম, বর্ণ এবং সামাজিক অবস্থানের মানুষই ঐ গৃহে সমবেত হতেন তাঁর মুখঃনিসৃত বাণী শোনার জন্য। ঐ সময়ের একটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। একজন দরিদ্র স্ত্রীলোক ফলমূল হস্তে স্বামীজীর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে তা নিবেদনপূর্বক উল্লেখ করেন যে তাঁর স্বামী ভগবৎ লাভের উদ্দেশ্যে সংসার ও স্ত্রীকে ত্যাগ করেছেন। স্বামীজী স্ত্রীলোকটিকে গীতাপাঠের উপদেশ দিয়েছিলেন ভগবৎলাভ ও মুক্তির বিষয়ে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য, এবং বলেছিলেন তার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে গার্হস্থ্যধর্ম পালন করলেই প্রকৃত ধর্মপথ অণুসরণ করা হবে। স্ত্রীলোকটি এর উত্তরে বলেছিল-গীতা তো শুধু পড়লেই হবে না, বুঝতে ও অনুভব করতে না পারলে তা কোন সুফলই দেবে না। অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করলেই বা বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান অণুসরণ করলেই ধার্মিক হওয়া যায় না, বিবেক, চেতনা ও অনুভূতি দিয়ে তা হৃদয়ঙ্গম করতে হয়।

স্বামীজীর পদধূলিতে পবিত্র এই গৃহের নাম পরে হয়েছিল 'বিবেকানন্দ লজ।'

কলম্বোতে প্রথম জনসমক্ষে ভাষণ

কলম্বোতে প্রথম জনসমক্ষে স্বামীজী ভাষণ দিয়েছিলেন স্থানীয় 'ফ্লোরাল হল'-এ 16ই জানুয়ারী, 1896 তারিখে এবং তাঁর ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল 'পুণ্যভূমি ভারত'। সেদিন শ্রোতার সংখ্যা এত অধিক হয়েছিল যে শ্রোতাদের হলের বাইরে ও দাঁড়াতে হয়েছিল।

পরের দিন স্বামীজী স্থানীয় শিব মন্দির দর্শন করেছিলেন। স্থানীয় দক্ষিণ ভারতীয় ও সিংহলের রীতি অনুযায়ী কোন বিশিষ্ট অতিথিকে সম্মান জানানো হত গৃহদ্বারে ফলমূল ও দ্বীপমালা সজ্জিত করে। স্বামীজী যখন নগরের মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছিলেন তখন দেখা গেল প্রাচীন প্রথাবলম্বনে সারাটা পথে প্রতি গৃহেই ঐরূপ করা হয়েছে।

জলপথের পরিবর্তে স্থলপথে মাদ্রাজ যাবার পরিকল্পনা

স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল কলম্বো থেকে জলপথে মাদ্রাজ যাবেন। কিন্তু সিংহলে আসবার পর তাঁর দক্ষিণ-ভারতীয় শিষ্যদের কাছ থেকে সনির্বন্ধ অনুরোধ আসতে লাগল দক্ষিণ-ভারতের বিভিন্ন নগরে অন্তত: একবার দর্শন দেবার জন্য। কাজেই তাঁর নতুন ভ্রমণসূচী হল স্থলপথে অশ্বযানে অণুরাধাপুর থেকে জাফনা যাত্রা।

অণুরাধাপুর

আমাদের মনে রাখতে হবে যে অনুরাধাপুর গৌতম বুদ্ধের সময়কাল থেকেই এক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। জনরব যে, 245 খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (245 AD) সারনাথের বোধগয়া থেকে আনীত আসল বোধিদ্রুমের একটি চারা এখানে প্রোথিত হয়েছিল, যে বোধিদ্রুমের নিচে ভগবান বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করেছিলেন।

সেই প্রোথিত বোধিদ্রুমের নীচে স্বামীজীর ভাষণ

বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে স্বামীজীর বরাবরই সুক্ষ্ম অনুভূতি ছিল এবং সেই বৃক্ষের নীচে সমবেত সহস্র শ্রোতার সমক্ষে তিনি এক সর্বধর্ম সৌহার্দ্র উদ্রেককারী ভাষণ দেন, যেখানে তিনি বলেছিলেন, ধর্ম সর্বপরিব্যাপক, কাজেই শিব, বিষ্ণু, বুদ্ধ এঁরা হলেন বিভিন্ন ধর্মমত ও বিশ্বাসের প্রতিমূর্তি এবং সর্বধর্মের সকল মানুষেরই উচিত অপরাপর ধর্মপথের অণুসরণকারীদের শুধুমাত্র সহ্য নয়, শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা। স্বামীজী ইংরেজীতে ভাষণ দিয়েছিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গেই তা তামিল ও সিংহলীতে অনূদিত হয়েছিল।

স্বামীজীর ক্যান্ডি-পরিদর্শন

19ই জানুয়ারী স্বামীজী এই স্থানে এসেছিলেন। এই স্থানটি বিখ্যাত এই কারণে যে এখানকার একটি স্থানীয় বৌদ্ধ মন্দিরে ভগবান বুদ্ধের একটি দাঁত সংরক্ষিত আছে। এটি বৌদ্ধদের একটি পবিত্র ধার্মিক স্মৃতিচিহ্ন। ভারতের

অনেক ক্রিকেটপ্রেমীর কাছে ও এই স্থানটি অতি পরিচিত কারণ শ্রীলঙ্কার ক্রিকেট দলের অনেক প্রতিভাবান ক্রিকেটার যেমন অর্জুন রণতুঙ্গা, মুথাইয়া মুরলীধরণের জন্মস্থান এটি।

জাফনা

স্বামীজী এই বন্দরশহরে পদার্পণ করেছিলেন 24 শে জানুয়ারী। সাম্প্রতিক অতীতে এই শহর এক ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিল যখন তামিল ও সিংহলীদের (Ceylonse) মধ্যে লড়াই চলছিল LTTE নামে সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের পৃথক Eelam গঠনের দাবি নিয়ে। জাফনায় স্থানীয় হিন্দু কলেজে স্বামীজীর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু বিশ্ববিশ্রুত সন্ন্যাসীর দর্শণ কামনায় এত লোকের সমাবেশ হয়েছিল যে মহাবিদ্যালয়ের বক্তৃতামন্ডপ থেকে 12 মাইল দূরেই স্বামীজীর অশ্বযান আটকে পড়েছিল। মহাবিদ্যালয় অবধি জাফনাকঙ্কোসান্তুরা রোডটিতে শুধুমাত্র তখন সমুদ্রের ঢেউয়ের মত মনুষ্যমস্তক দেখা যাচ্ছিল। প্রায় দু'মাইল ব্যাপী জায়গা জুড়ে এই বিপুল জনসমাবেশ ঘটেছিল।

শ্রীলঙ্কার দ্বীপভূমিতে স্বামীজীর ভ্রমণ শেষ হল 25 শে জানুয়ারী। তিনি জাফনা ছাড়লেন জলপথে দেশী জাহাজে করে এবং পঞ্চাশ মাইল দূরবর্তী পাম্বাণ অভিমুখে যাত্রা করলেন। সেখানে তিনি পৌঁছেছিলেন 26 শে জানুয়ারী।

26 শে জানুয়ারী ভারতের মাটিতে স্বামীজীর অবতরণ

জাহাজ 26 শে জানুয়ারীর (1897) অপরাহ্নে স্বামীজীকে

নিয়ে পাম্বাণ দ্বীপে অবস্থিত পাম্বান রোডে উপস্থিত হল। কিন্তু স্বামীজী জাহাজ থেকে তখনই নামতে পারলেন না। কারণ তিনি সংবাদ পেলেন যে রামনাদ-রাজ তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য রাজকীয় নৌকা নিয়ে পাম্বাণ রোডে আসছেন।

সেইমত রামনাদের রাজা শ্রীভাস্কর সেতুপতি বিকেল 5টার সময় এসে স্বামীজীকে জাহাজ থেকে নিজের রাজতরণীতে নিয়ে গেলেন এবং পাত্র-মিত্র সভাসদসহ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। রাজা জানালেন যে এই কাজটি রাজমুকুট পরার চাইতেও তাঁর কাছে বেশী হৃদয়গ্রাহী। স্বামীজীও প্রত্যুত্তরে জানালেন, যাঁদের সাহায্য, সমর্থন ও সহযোগিতায় স্বামীজীর পক্ষে বিদেশে পদার্পণ সম্ভব হয়েছিল তাঁদের অন্যতম রাজা রামনাদ। কাজেই ভারত ভূখণ্ডে স্বামীজী রামনাদের মহারাজার হাতেই প্রথম উষ্ণ ও আন্তরিক অভ্যর্থনা পেলেন। সেই রাজতরণী যা বিশেষভাবে স্বামীজীর সম্মানার্থে আনীত হয়েছিল তা স্বামীজীকে নিয়ে পাম্বাণ রোড থেকে পাম্বান জেটিতে পৌঁছল। সেখানে এক সুসজ্জিত মন্ডপে পাম্বান নগরবাসীর পক্ষ থেকে মেয়র নাগালিনগম পিল্লাই এক অভিনন্দনপত্র পাঠ করলেন। এই অভিনন্দনের উত্তরে স্বামীজীও এক ছোট্ট সুন্দর বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষণ দিলেন যেখানে তিনি বার্তা দিয়েছিলেন যে বিদেশী শক্তি ভারতীয় জাতীয় সত্ত্বাকে পঙ্গু করে রেখেছে। (এখানে উল্লেখ্য যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 1885 সালে কলকাতায় গঠিত হয়েছিল) স্বামীজী বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এই বিষয়ে যে ভারত আজ অবনত ও হীন হলেও যে নবজাগরণের ঢেউ আজ সর্বত্র

দৃষ্টিগোচর হচ্ছে তা আবার ভারত কে জাতিগত ভাবে, ধর্মগত ভাবে পৃথিবীর মধ্যে এক মহৎ পদবীতে উন্নীত করতে পারবে।

পাম্বাণে স্বামীজীর বসবাসকাল

স্বামীজী পাম্বাণে দুদিন ছিলেন। তিনি এই দুদিন মহারাজার বাংলোতেই অবস্থান করেছিলেন। যে রাজশকটে করে স্বামীজীকে রাজবাংলোয় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার পিছনে রাজা এবং অমাত্যরা শোভাযাত্রা করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু রাজা এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে শকট থেকে ঘোড়া খুলে অপর সকলের সাহায্যে স্বয়ং গাড়ি খানি টেনে নিয়ে চলা শুরু করলেন। এ থেকে স্পষ্ট হয় রামনাদের রাজা স্বামীজীর প্রতি কতখানি শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করেছিলেন।

পরদিন স্বামীজী রামেশ্বরম শিব মন্দির দর্শন করলেন। এই মন্দিরটি ভারতীয় স্থাপত্যকলার এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ছিল। ঐ সময়ে রামেশ্বরম শিব মন্দিরটি ত্রিভাঙ্কুরের মহারাজা রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। ঘটনাচক্রে সেই দেশীয় রাজ্যটি এখন মাদ্রাজ রাজ্যের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে তামিলনাড়ু রাজ্য হিসাবে পুর্নগঠিত হয়েছে। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা একজন পরহিতৈষী রাজা ছিলেন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি বিলুপ্ত হওয়ার পর ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা শ্রী চিত্র তিরুনাল ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (ত্রিবান্দ্রাম) নামে এক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য প্রভূত অর্থ দান

করেছিলেন। ত্রিবান্দ্রামের বর্তমান নাম এখন তিরুবনন্তপুরম এবং এটি এখন কেরালার রাজধানী।

রামেশ্বরম মন্দিরে স্বামীজী ইংরেজীতে এক ভাষণ দিয়েছিলেন যা মিস্টার নাগালিঙ্গাম পিল্লাই দ্বারা স্থানীয় ভাষায় অনূদিত হয়েছিল। সেই বিখ্যাত ভাষণে স্বামীজী প্রাণস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন যে ভগবান শিবকে উপাসনা করতে হলে সর্বপ্রথম শিবের সন্তানগণের সেবা করতে হবে। এটিই ছিল স্বামীজীর **নব-নারায়ণ সেবা** কর্মসূচীর ভিত্তিস্বরূপ।

রামনাদ থেকে মাদ্রাজ হয়ে কুম্ভোকোনম এবং মাদুরাই যাত্রা

সেই সময় মোটর যানে যাত্রা না জনপ্রিয় ছিল, না তা সহজসাধ্য ছিল। কাজেই রামনাদ থেকে মাদুরাই পর্যন্ত তাঁর যাত্রা রিলে যাত্রা অর্থাৎ মাঝে মাঝে বিরতি নিয়ে হচ্ছিল। রামনাদ ত্যাগের পর তাঁর প্রথম বিরাম স্থল ছিল পরম কুড়ি। তারপর সেখান থেকে মনমদুরা। মনমদুরা থেকে তিনি মাদ্রাজ যাত্রা করেছিলেন এবং পথিমধ্যে তিনি মাদুরাই (মীনাক্ষী মন্দিরের জন্য বিখ্যাত), ত্রিচি (পূর্বের ত্রিচিনাপল্লী) এবং তাঞ্জোর (বর্তমান তাঞ্জাভুর) ভ্রমণ করেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে তাঞ্জাভুর মন্দিরগাত্রের স্থাপত্যকলার জন্য বিখ্যাত।

হাতি দ্বারা সজ্জিত শোভাযাত্রা

মাদুরাই শহরটি ভাইগাই (Bhaigai) নদী তীরে অবস্থিত। মীনাক্ষীমন্দির ও অন্যান্য দেবমন্দিরাদির জন্য ভক্তদের কাছে

এই নগর অতীব আদরণীয় ছিল। স্থাপত্য শিল্পের জন্যে এবং আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্যের নিদর্শন হিসাবেও এই মন্দির বিখ্যাত। তাঞ্জাভুর ও মন্দির ও শিল্পকলার নিদর্শন হিসাবে বিখ্যাত স্থান এবং এখানকার মন্দিরগুলো পল্লভ এবং চোল রাজাদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু মীনাক্ষী মন্দিরের যে বিশেষ নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তা হল এর হস্তীশোভিত বিশেষ শোভাযাত্রা, যা মন্দিরের নিজস্ব হাতিকাহিনী দ্বারা সুন্দর ও সারিবদ্ধভাবে শৃঙ্খলার সঙ্গে ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে প্রদর্শিত হয়। হস্তীশোভিত এরকম শোভাযাত্রা মাইসোর রাজবাড়িতে এবং এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব থাইল্যান্ডে প্রদর্শিত হতে দেখা যায়। (বলা যায় যে থাইল্যান্ডে 3700'র বেশী হাতি আছে)। কাজেই থাইল্যান্ড আর লাওস্ হাতিদের জন্য বিখ্যাত এবং থাইল্যান্ডে ভ্রমণকারীদের এক আকর্ষণের বস্তু হল হাতি।

মাদুরাইতে নাগরিক সংবর্ধনা

যদি আমরা দ্রাবিড় সংস্কৃতির বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাব যে সভ্যতার অগ্রগতি সেখানে হয়েছে তার মধ্যে তিরুপতির মন্দির স্থাপত্য এবং আধ্যাত্মিক উচ্চতায় সর্বপ্রথম স্থান দখল করেছে।

মাদুরাইয়ের নাগরিক সংবর্ধনা সভায় স্বামীজীকে উদ্দেশ্য করে যে অভিনন্দন পত্রটি পাঠ করা হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল যে ভারতীয় বেদের দর্শনই পৃথিবীর দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন। কিন্তু এর উত্তরে স্বামীজী মধ্যপন্থা অবলম্বন করে বলেছিলেন যে একদিকে কুসংস্কারপূর্ণ,

জাতিভেদে জর্জরিত প্রাচীন সমাজ-অপরদিকে ইওরোপীয় জড়বাদ, নাস্তিকতা, যা পাশ্চাত্য জগতের উন্নতির মূল ভিত্তিতে প্রবিষ্ট-এই দুইটি থেকেই সাবধান থাকতে হবে। দ্বিতীয়ত: আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, আমরা যেগুলিকে ধর্মবিশ্বাস বলি, সেগুলি আমাদের নিজ নিজ ক্ষুদ্র গ্রাম্যদেবতা সম্বন্ধীয় এবং কুসংস্কারপূর্ণ দেশাচার মাত্র। এই সকল প্রথা ও আচারের পরিবর্তন চিরকালই হয়েছে। বেদ চিরকাল একরূপ থাকবে কিন্তু কোন স্মৃতির প্রাধান্য যুগপরিবর্তনেই শেষ হয়ে যাবে। তিনি বলেছিলেন যে তিনি চান গোড়ার নিষ্ঠাটুকু। এবং তার সঙ্গে জড়বাদীর উদারভা ব-হৃদয় সমুদ্রবৎ গভীর, অথচ আকাশ বৎ প্রশস্ত হওয়া চাই। পরিশেষে তিনি কোন প্রথার নিন্দা না করে সত্যের সাক্ষাৎলাভ করে ঋষিত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে এবং তা অবলম্বনে নিজের ও অপরের মুক্তিসাধন করতে আহ্বান জানালেন।

লোকশ্রুতি যে, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ যখন মস্কোর রামকৃষ্ণ মিশনের দায়িত্বে ছিলেন, তখন তিনি তৎকালীন রাশিয়ান রাষ্ট্রপতি গোর্বাচেভ (Gorgachor) এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। বলা হয় যে, গোর্খাচেভ তাঁর গ্লাসনস্ত এবং পৈরেস্ত্রৈকা ভাবাদর্শদুটি স্বামী লোকেশ্বরানন্দজী থেকেই পেয়েছিলেন। পৈরেস্ত্রৈকা শাসনকালের অবসানের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গান আরম্ভ হয়।

সারা জীবন ধরে স্বামীজী মানুষের দৃষ্টি-আকর্ষণ করেছিলেন এই সত্যের দিকে যে ধর্ম এবং ধর্মীয় রীতিনীতির মধ্যে এক সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। ধর্মীয় রীতিনীতিগুলি বেশিরভাগই

ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য, ব্যাপ্তি ও গভীরতা থেকে অনেক দূরে সরে এক পুরোহিত তন্ত্রের সৃষ্টি করে থাকে, স্বামীজী যার প্রবল বিরোধী ছিলেন। অনেক দার্শনিক মনে করেন যে মুসলমানরা তাদের মৌলবাদী আচার-অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি এবং তাই আজও তিন-তালাক, বহু-বিবাহ এবং হিজাব ও বোরখা প্রথা দ্বারা অবমানিত হচ্ছেন।

কুম্ভ-কোনম থেকে মাদ্রাজ

এটা স্পষ্ট যে পূর্ববর্তী নগরগুলিতে স্বামীজী এক আবেগপূর্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন। কুম্ভকোনম রেল স্টেশনে স্বামীজীকে অভ্যর্থনাকারী জনগণের অন্তর্গত ছিলেন মহারাজার দেওয়ান, বড় জমিদার, বৃহৎ বিনিয়োগকারী (Sheshaiya Shashtriar), সম্ভ্রান্ত নাগরিকবৃন্দ এবং অবশ্যই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হাজার হাজার সাধারণ নগরবাসী। এমনকি প্রসিদ্ধ ও অভিজাত সংবাদপত্র মাদ্রাজ মেল তাদের ইংরেজী দৈনিকে খবর প্রকাশ করেছিল সাধারণ জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগের বিষয়ে। কুম্ভকোনমে তাঁর অভ্যর্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল পোর্টার টাউন হল-এ। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার অনেক আগে থেকেই সভাগৃহটি দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এখানে স্বামীজী যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার বিষয়বস্তু ছিল-"বেদান্তের তাৎপর্য্য।" কুম্ভকোনমে স্বামীজী দুটি অভ্যর্থনা পেয়েছিলেন। একটি হিন্দু নাগরিকদের পক্ষ থেকে এবং অপরটি হিন্দু ছাত্রসমাজের পক্ষ থেকে।

মাদ্রাজের পথে

স্বামীজী তিন দিন কুম্ভকোণমে এবং নয় দিন মাদ্রাজে থেকেছিলেন। (6^{th} Feb, to 14^{th} Feb) এ কথা অনস্বীকার্য যে সমগ্র দক্ষিণ ভারতের জনগণের এক গভীর অর্ন্তদৃষ্টি ও স্বত:স্ফূর্ত বোধশক্তি ছিল, যা তাদেরকে স্বামীজীর অর্ন্তনিহিত ক্ষমতা, জ্ঞান, দূরদৃষ্টি ও গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির স্বরূপ বুঝতে সাহায্য করেছিল তথাকথিত বুদ্ধিমান বাঙালীর অনেক আগেই। এ কথা উল্লেখ্য যে কোন বাঙালী জমিদার স্বামীজীর বিদেশ যাত্রায় বিন্দুমাত্র অর্থসাহায্যও করেন নি। এ কথা ও ভিত্তিহীন নয় যে স্বামীজী দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে আত্মিক ও মানসিকভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন প্রধানত তিনটি কারণের জন্য-প্রথমত: রামনাদের রাজা তাঁর শিকাগো যাত্রায় অর্থ সাহায্য করেছিলেন। দ্বিতীয়ত: স্বামীজী কন্যাকুমারীকার অধুনা বিখ্যাত বিবেকানন্দ শিলায় ধ্যান করেছিলেন, যা কিনা তামিলনাড়ুর প্রশাসনিক অধিক্ষেত্রের মধ্যে ছিল এবং তৃতীয়ত: তাঁর দক্ষিণ ভারতীয় শিষ্য বিশেষত: আলাসিঙ্গাপেরুমল এবং স্বামী শিবানন্দ, উভয়ই তামিলনাড়ুর অধিবাসী ছিলেন। আজও চিপকের প্রধান মেলার নাম স্বামী শিবানন্দের নামে হয়। স্বামীজী তাঁর দক্ষিণ-ভারতীয় শিষ্য দর্শনের অধ্যাপক আলাসিঙ্গা পেরুমল কে খুব ভালবাসতেন।

মাদ্রাজে রাজকীয় সংবর্ধনার আয়োজন

মাদ্রাজে স্বামীজীর আগমণের এক মাস আগেই তাঁর সংবর্ধনার ব্যবস্থাপনা করার জন্য মাদ্রাজ হাইকোর্টের এটর্নি

মিস্টার বিলিগিরি আয়েঙ্গারের বাড়িতে একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। তাঁরা স্বামীজীর মাদ্রাজ বাস, তাঁর রাজকীয় সংবর্ধনার কর্মসূচী ইত্যাদি নিয়ে এক পরিকল্পনার রূপরেখা স্থির করেছিলেন। এর মধ্যে আর্থিক ব্যয়নির্বাহের ব্যাপারটিও ছিল। এই উদ্দেশ্য নাগরিকবৃন্দের কাছ থেকে সংগৃহীত অর্থসাহায্যের পরিমাণ প্রত্যাশার অনেক বেশী হয়েছিল। স্বামীজীর মাদ্রাজে অবস্থানের জন্য শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গারের 'ক্যাসল কার্নান' নামে একটি প্রাসাদোপম বাড়ি মনোনীত করা হয়েছিল। স্থানীয় ইংরেজী দৈনিক 'মাদ্রাজটাইমস্' স্বামীজীর আগমনের সপ্তাহকাল আগে থেকেই তাঁর সংবধনাসভার প্রস্তুতি পর্বের বিবরণ দেওয়া শুরু করেছিল।

ক্যাসল-কার্নানে বিজয়-তোরণ

স্বামীজীর অভ্যর্থনার উদ্দেশ্য গঠিত সমিতিতে যে কেবলমাত্র বিশেষ সম্ভ্রান্ত নাগরিকবৃন্দ, আইন জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করাই ছিলেন তা নয়, মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্যম্ আয়ার স্বয়ং এই সমিতির সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

মাদ্রাজ রেলস্টেশনের পথে-স্বামীজীর

স্বামীজীর ট্রেন যতগুলি স্টেশনে থেমেছিল সর্বত্রই তিনি বিপুল সংবর্ধনা পেয়েছিলেন। এর মধ্যে মায়াবরম্ (বা ময়ূরম্) স্টেশনে এক বিরাট জনতা শ্রীযুক্ত ভি. নটেশ আয়ারের নেতৃত্বে স্বামীজীকে প্ল্যাটফর্মের উপরেই অভিনন্দিত করেছিল।

নির্ধারিত স্টেশনের বাইরেও আবেগাপ্লুত জনগণ স্বামীজীকে একবার দর্শনমাত্র করার জন্য কি বিপুলভাবে উৎসাহিত ছিল তার উদাহরণ হল মাদ্রাজের নিকটবর্তী একটি ছোট স্টেশনের ঘটনা। সেখানে ট্রেন থামার কথা নয়, কিন্তু জনতা স্টেশন কর্তৃপক্ষকে দু'-চার মিনিটের জন্য ট্রেন থামাতে অণুরোধ করেছিল, অনুরোধ উপেক্ষিত হওয়ায় ট্রেন আটকানোর জন্য বিক্ষুব্ধ জনতা রেললাইনের উপর শুয় পড়েছিল। ট্রেনের গার্ড তখন বিপদ বুঝে ট্রেন থামালেন এবং জনতা স্বামীজীর কামরার দিকে ছুটল। স্বামীজী হাত তুলে সকলকে আশীর্বাদ জানালে জনতার মনোবাসনা পূর্ণ হল এবং ট্রেন ও মাদ্রাজ অভিমুখে অগ্রসর হল।

মাদ্রাজের কেন্দ্রীয় রেলস্টেশনের অভূতপূর্ব অভিনন্দন

স্বামীজীকে নিয়ে মাদ্রাজগামী ট্রেনটি 6 ই ফেব্রুয়ারী সকাল সাড়ে সাতটায় স্টেশনে পৌঁছেছিল। ট্রেনটি দক্ষিণ প্ল্যাটফর্মে থামা মাত্র জনতা উচ্চৈঃস্বরে হর্ষধ্বনি করে উঠেছিল। স্বামীজীর সঙ্গে ছিলেন তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী নিরঞ্জনানন্দ ও স্বামী শিবানন্দ, আর ছিলেন তাঁর ইওরোপীয় শিষ্য মিস্টার গডউইন। ক্যাপ্টেন শ্রীযুক্ত জে. এইচ্ সেভিয়ার ও তাঁর পত্নীও সেখানে ছিলেন। এগমোর স্টেশনটি পতাকা, তালপত্র এবং পাতাবাহার প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত হয়েছিল এবং প্ল্যাটফর্মের উপর লাল কার্পেট বিছানো হয়েছিল। গোটা প্ল্যাটফর্মটিই লোকে-লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। সমবেত জনতা গোলাপ জল ছিটিয়ে, ফুলের পাপড়ি বর্ষণ করে স্বামীজীকে সম্মান জানিয়েছিল। স্বামীজী

প্ল্যাটফর্মের বাইরে অপেক্ষারত এক যুগলাশ্ববাহিত গাড়িতে 'ক্যাসল কার্নান' অভিমুখে যাত্রা করলেন। এই গাড়িতে তাঁর সঙ্গো বিচারপতি সুব্রহ্মাণ্য আয়ার ও ছিলেন।

স্টেশন থেকে ক্যাসল্ কার্নান অভিমুখে দু'মাইল ব্যাপী যাত্রা

স্বামীজীকে নিয়ে শ্বেতশুভ্র অশ্বচালিত যানটি ক্যাসল-কার্নান অভিমুখে যাওয়ার সময় অগণিত উৎসাহী মানুষের এক শোভাযাত্রা তাঁর গাড়িটিকে অণুসরণ করছিল। পথের দুপাশের বাড়িগুলির বারান্দা তাঁর গুণমুগ্ধ মানুষের ভিড়ে পরিপূর্ণ ছিল। স্বামীজীকে কেন্দ্র করে তাঁর স্বদেশ ভারতের মানুষের এই উচ্ছ্বাস সত্যি সত্যি এক গণ-উন্মাদনায় পরিণত হয়েছিল। সারা পথ জুড়ে অনেকগুলি বিজয়তোরণ নির্মিত হয়েছিল যাতে লেখা ছিল 'স্বামী বিবেকানন্দ সুস্বাগত'। 'পুর্ণামালি হাই রোড' (Poonamalu High Road) সংলগ্ন পথের দু'ধারে অনেক অভ্যর্থনা সভামন্ডপ নির্মিত হয়েছিল। (Poonamale High road এর বর্তমান নাম Rajaj Salai road, যা কিনা ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারী নাম অনুসারে নামাঙ্কিত)। পথিমধ্যে নির্মিত বিজয়তোরণগুলিতে যে অভিনন্দনভাষ্য লিখিত ছিল তার ভাষা ছিল বিভিন্ন-যথা সংস্কৃত, তামিল, তেলেগু এবং অবশ্যই ইংরেজী। স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে তখনকার ঘটনাপ্রবাহের যে বিবরণ প্রকাশিত হচ্ছিল তা মধ্যে স্পষ্টরূপে উল্লেখিত ছিল যে মাদ্রাজ শহরে ইতিপূর্বে কোন ঘটনা জনগণের এক

বৃহৎ অংশকে এত প্রবলভাবে আন্দোলিত করতে, এত হৃদয়স্পর্শী শ্রদ্ধার উদ্রেক করতে পারে নি, যা কিনা স্বামী বিবেকানন্দের ভারত প্রত্যাবর্তনকালে ঘটেছিল। এর কারণ বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে, স্বামীজীর জীবনব্রতের ভিত্তি প্রস্তর আধ্যাত্মিকতা। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা অর্থে কেবল কর্মহীন অবসরে ভগবৎ আরাধনা নয়, বরং হিন্দুধর্মের বেদ-সারাংশ উপনিষদের মূল বাণী যে বেদান্ত তাকে দৈনন্দিন জীবনের সর্বত্র প্রয়োগ করে শিবজ্ঞানে জীবসেবা করে মানবজীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্থাৎ মুক্তিসাধনের পথে এগিয়ে যাওয়াই প্রকৃত আধ্যাত্মিকতকা। এই কথা পাশ্চাত্যজগতে প্রচার করে হিন্দুধর্মের উত্তম দিকটার প্রতি তিনি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, ধর্মজগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের যত মত তত পথ এর বাণীর সঙ্গে বিশ্ববাসীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এই কারণেই সর্বপ্রথম হিন্দুসন্ন্যাসী হিসাবে তিনি চিরস্মরণীয় স্থান অধিকার করলেন।

ভিক্টোরিয়া হল এর ঘটনা

মাদ্রাজ শহরে তাঁর নয় দিন (9 days) ব্যাপী অবস্থানকালে স্বামীজী চারটি জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে প্রথমটি ছিল ৮ই ফেব্রুয়ারী ভিক্টোরিয়া হল এর নাগরিক সংবর্ধনা সভায়। তিনি ক্যাসল-কার্নাল থেকে সংবর্ধনা হল-এ পৌঁছেছিলেন। কিন্তু তাঁর পৌঁছবার আগে থেকেই হল এত জনপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল যে সেখানে আর তিলধারণের ও

স্থান ছিল না। হলের বাইরেও প্রচুর দর্শক সমাগম হয়েছিল। এমতাবস্থায় জনতার আবেদনে সাড়া দিয়ে হলের বাইরে খোলা জায়গায় বক্তৃতার আয়োজন করতে হল। তিনি মাদ্রাজের একখানি অশ্ব-যানে চড়ে, তাঁরই ভাষায় বলতে গেলে-'গীতার ভঙ্গিতে' বক্তৃতা আরম্ভ করলেন, তা দেখে উপস্থিত প্রায় ১০,০০০ (10,000) দর্শক আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে তুমুল হর্ষধ্বনি করে উঠল। এছাড়া তিনি আরও চারটি মঞ্চ বক্তৃতা দিয়েছিলেন যার মধ্যে একটি ছিল ৯ই ফেব্রুয়ারী এবং বক্তৃতার বিষয় বস্তু ছিল-আমার সমরনীর্তি (My plan of compaign) এই বক্তৃতাটি শোনার জন্য উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে ১ টাকা এবং ২ টাকা প্রবেশ মূল্যে ধার্য করা হয়েছিল। সমস্ত টিকিটই বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। স্থিরীকৃত হয়েছিল যে প্রাপ্ত অর্থ স্বামীজীর ভারতীয় কার্যের জন্য ব্যয়িত হবে। এই বক্তৃতাটি ভারতে ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার উপর দেওয়া হয়েছিল। এই ভাষণটিতে তিনি এ কথারই পুণরুল্লেখ করলেন যে অন্যান্য সমাজ-সংস্কারকরা কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠানপদ্ধতির আংশিক সংস্কারের কথাই বলেছেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে ধর্মের ভিত্তিগত সংস্কারসাধনের পথেই অগ্রসর হতে চান, যাতে হিন্দুধর্ম তার অবলুপ্ত গৌরব পুনরায় ফিরে পেতে পারে। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে ভারতে এর আগেও অনেক ধর্মসংস্কারক দেখা দিয়েছিলেন যেমন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, শিখ ধর্মগুরু নানক, কবীর, রামানুজ এবং শঙ্করাচার্য। তিনি বলেন পূর্বের এই ধর্মসংস্কারকগণ তাঁদের মত ও পথে ভুল ছিলেন না। তাঁরা আমাদের ভুলগুলি

দেখিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু আমরা তাঁদের প্রদর্শিত মত ও পথ গ্রহণ করিনি। এই সমস্যাসঙ্কুল জটিল সামাজিক আবর্তে মুক্তিসাধনের উপায় আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় ভিত্তির উপর স্থাপিত হওয়া দরকার, সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে নয়। তাঁর দৃষ্টিকোণ ছিল এই যে আধ্যাত্মিক সংস্কার আদর্শগতভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি এবং ভারতীয় জাতীয়তত্ত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া দরকার। পাশ্চাত্যের অণুকরণ করে নয়, সংস্কার কার্যধারা কেবলমাত্র ভারত কেন্দ্রিক, ভারতের সমাজ কেন্দ্রিক এবং ভারতের ধর্মকেন্দ্রিক হওয়া দরকার। তাঁর মত ছিল যে একজন ভারতীয়ের পক্ষে ভারতের পুর্নজাগরণের রূপরেখা স্থির করার আগে ভারতীয় জাতীয় সংস্কৃতির গভীরে যাওয়া দরকার। এক দেশের পক্ষে যে নীতি নিরাময়ের উপায়, অন্য দেশের পক্ষে তা বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। স্বামীজীর ৯ ফেব্রুয়ারীর ভাষণের সবটাই পরের দিন অর্থাৎ ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭ সালের মাদ্রাজ টাইম্‌সে পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল। এমনকি ফরাসী দার্শনিক রোমেণ রোনাল্ড (Romain Rolland) তাঁর এই ভাষণটিকে স্বামীজী প্রদত্ত ভাষণগুলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করেছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিবরণ অনুযায়ী, উচ্চ প্রবেশমূল্য সত্ত্বেও স্বামীজীর বক্তৃতাসভা সম্ভ্রান্ত নাগরিকবৃন্দ এবং ছাত্রসমাজ দ্বারা পরিপূর্ণ হয়েছিল। সেই বক্তৃতার অর্ন্তনিহিত সারমর্মটি উপস্থিত সমস্ত দর্শকমণ্ডলিকে অভিভূত করেছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বপূর্ণ উপস্থিতি, বুদ্ধিদীপ্ত বাগ্মিতা, উৎসাহব্যঞ্জক বাচনভঙ্গী উদার দৃষ্টিকোণ, এবং গভীর ও আন্তরিক দেশপ্রেমসঞ্জাত জ্ঞানগর্ভ

ভাষণ মহাকালের এক মঙ্গালময় সত্যকে হৃদয়স্পর্শী আবেগে দর্শকমণ্ডলীর সামনে উপস্থিত করতো। সেইজন্য তাঁর আবেদন এত আকর্ষণীয়, এত দৃঢ় ও অভ্রান্ত হত।

১১ই ফেব্রুয়ারী স্বামীজী 'ভারতীয় মহাপুরুষগণ' সম্বন্ধে তাঁর দ্বিতীয় বক্তৃতা দিলেন। সেই বক্তৃতায় তিনি ভারতের প্রণম্য মহাপুরুষ তথা ভগবৎসাধক ও দার্শনিক যেমন শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, চৈতন্যদেব এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছিলেন। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে শঙ্করাচার্য্যের এক অসাধারণ বুদ্ধি সঞ্জাত দার্শনিক মনন ছিল, শ্রী চৈতন্যদেব এবং রামানুজের ছিল সামাজিক উন্নয়নের জন্য হৃদয়নিঃসৃত গভীর বাসনা, কিন্তু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ছিল হৃদয় ও আত্মার এক গভীর মেলবন্ধন যা জগৎব্যাপী মানবসমাজের আত্মিক সম্পর্কের উপর আলোকপাত করেছিল। স্বামীজী তাঁর গুরু ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করেছিলেন অনেক ব্যাপকতরভাবে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পাশ্চাত্য জীবনীকারদের ও তাঁর সম্বন্ধে একই অভিমত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীকার মিস্টার ক্রিস্টোফার ইশারউডের (Christopher Isherwood) বই 'শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর শিষ্যগণ' এ প্রসঙ্গো উল্লেখ করা যেতে পারে।

স্বামীজী প্রদত্ত ভাষণগুলির ব্যাপক অণুসরণ (Coverage) দেখা যেত দুটি গুরুত্বপুর্ণ দৈনিকের প্রাতঃকালীন সংস্করণে, যেমন 'মাদ্রাজ টাইমস্' এবং 'দ্য হিন্দু'। এই উভয় দৈনিকই মত প্রকাশ করেছিল যে স্বামীজীর বাগ্মীতা এক অসাধারণ





চিকাগো ধর্মসভায় বক্তৃতামঞ্চে স্বামীজি



চিকাগো ধর্মসভায় স্বামীজি



গোপাল লাল ঠাকুরের গৃহে গুরুভ্রাতাগনসহ স্বামীজি



কাশ্মীরে বিদেশিনি অনুগামীগন সহ স্বামীজি



স্বামীজির সহকর্মী অ্যানি বেসান্ত



স্বামীজীর সহকারী আমেরিকান ইঞ্জিনীয়ার স্যার হিরাম ম্যাক্সিম



কন্যাকুমারিকায় বিবেকানন্দ স্মারকশিলা ও মন্দির

উচ্চমাণের নৈপুণ্যে পরিপূর্ণ এবং সেটি স্বামীজীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিপ্রসূত জ্ঞানের ভিত্তির উপর প্রোথিত। স্বামীজীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু যেহেতু বেদ-সারাংশ উপনিষদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান, সেহেতু তা অনেকের কাছেই হয়তো পূর্বজ্ঞাত। কিন্তু স্বামীজীর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিকোণ তাঁর বক্তব্যবিষয়কে এমন এক সময়োপযোগী প্রেক্ষাপটে উপস্থিত করেছিল যে তা সমগ্র পৃথিবীর সব ধর্ম এবং অবশ্যই হিন্দুধর্মকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করেছিল।

মাদ্রাজে স্বামীজীর তৃতীয় বক্তৃতাটি ১৩ই ফেব্রুয়ারী বিখ্যাত পাচেয়্যাপ্পা হলে হয়েছিল। এই ভাষণে তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল-'ভারতীয় জীবনে উপনিষদ বা বেদান্তের কার্যকারিতা।' তিনি বলেছিলেন যে উপনিষদ হল বেদে বর্ণিত দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের তাৎপর্য্যগত বিবরণ।

ভারতের সুপ্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বেদে যে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লিপিবদ্ধ আছে, তা নিয়ে যদি কোন মতবিরোধ উপস্থিত হয়, তবে উপনিষদই হল তার সমাধান। সামগ্রিকভাবে তিনি উপনিষদের সেই জ্ঞানেরই পুনরুল্লেখ করেছিলেন যে জ্ঞান আমাদেরকে নিজের প্রকৃত সত্ত্বার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে। আমরা এই পৃথিবীর বুকের সমস্ত জীবকূল কেবলমাত্র শরীর ও মন দিয়ে গঠিত ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জীব নই, আমাদের প্রকৃত সত্ত্বা হল আমাদের চেতনা, যা কিনা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর বা পরমাত্মা। আমরা সকলেই সেই পরমাত্মার কাছেই ফিরে যাব, পূর্ণতাপ্রাপ্তি হবে প্রত্যেক জীবাত্মারই। আমরা এখন যে মানবীয় অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে চলেছি, তা আমাদের অতীত

কার্য ও চিন্তারাশির ফল। আর বর্তমানে যেরূপ চিন্তা ও কার্য করছি, তা ভবিষ্যতে যে পথে প্রবিষ্ট হব, তা নির্ধারণ করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকলেই এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করে সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হবে। তা সত্ত্বেও আমাদের বাইরে থেকে কিছু সহায়তা প্রয়োজন। আর যখন এই সহায়তা পাওয়া যায়, তখন আত্মার উচ্চতর শক্তি ও আপাত অব্যক্ত ভাবগুলি ফুটে ওঠে, আধ্যাত্মিক জীবন সতেজ হয়ে ওঠে, সাধক অবশেষে শুদ্ধস্বভাব ও সিদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু এই সহায়তার অর্থ এই নয় যে মানুষকে বলপূর্বক কোন বিশেষ ধর্মমত বা পথ গ্রহণ করানো। তাঁর মতে ইষ্টদেবতা বিষয়ক শিক্ষাই হল ভারতের মূল ধর্মভাবের বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক ব্যক্তিরই নিজের পথ বেছে নেওয়ার এবং নিজের পথে ভগবানকে অন্বেষণ করার অধিকার আছে। তাহলে এই সংজ্ঞা অনুসারে হিন্দুধর্মের বিশাল সাম্রাজ্যের পতাকা কোন সৈন্যবাহিনী বহন করতে পারে না, কারণ হিন্দুধর্মের যেরূপ আধ্যাত্মিক লক্ষ্য হচ্ছে ঈশ্বরলাভ, সেরূপ তার আধ্যাত্মিক অনুশাসন হচ্ছে-স্ব-স্বরূপ-প্রাপ্তি বিষয়ে প্রত্যেক আত্মারই পূর্ণ স্বাধীনতা।

১৪ই ফেব্রুয়ারী স্বামীজী 'ভারতের ভবিষ্যৎ' বিষয়ে তাঁর চতুর্থ বক্তৃতা দিলেন 'হার্মস্টন সার্কাস' এর তাঁবুতে। সেদিন বক্তৃতা স্থলে কয়েক হাজার মানুষের সমাগম হয়েছিল। তাঁর বক্তব্য বিষয় কেন্দ্রিভূত ছিল জাতীয় ঐক্যের উপর। তাঁর দর্শন এই ছিল যে ধর্ম যেহেতু যোগাযোগের সেতু। তাই আমাদের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা মেনে চলতে হবে। কারণ ধর্মীয় ভিত্তির উপর জাতীয় ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারলে বিদেশী

আক্রমণকারীরা বার বার আমাদের মাতৃভূমিকে আক্রমণ করবে, যা কিনা অতীতে বহুবার ঘটেছে। তিনি মতপ্রকাশ করেছিলেন যে অতীতে এতবার বিদেশী শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়েও ভারত তার অনন্য স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে হিন্দুধর্মের ব্যাপক সর্বগ্রাহিতার জন্যই। তাঁর বাণী এই ছিল যে আমাদের যে কেবলমাত্র আমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করা উচিত তাই নয়, আমাদের মাতৃভূমিকে আমাদের ভারতমাতা হিসাবে সর্বশক্তি দিয়ে উপাসনা করা উচিত। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে, যখন ভারত ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জন করল। ব্রিটিশ শক্তি যখন ভারত ছেড়ে চলে গেল, তখন ৫২৯ (৫২৯) টি দেশীয় রাজ্য ছিল এবং তাদের নিজস্ব স্বাধীন অস্তিত্ব ছিল বিদেশনীতি, সুরক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ছাড়া। তার মধ্যে ৫২৬ (৫২৬) টি রাজ্য ভারত রাষ্ট্রে যোগদান করেছিল যে তিনটি রাজ্য ভারত রাষ্ট্রে যোগদান করেনি তারা হল হায়দ্রাবাদ, জুনাগড় এবং কাশ্মীর। আমরা স্বাধীনতার সত্তর (৭০) বছর পরও ভয়াবহ কাশ্মীর সমস্যায় বিব্রত। এই সমস্ত কিছু বিবৃত হয়েছে ভি. পি. মেনন এর বই 'Integraton of Indian princely states'—এ। শ্রীমেনন ছিলেন তখনকার **MHA সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এর** সভাপতি। এমনকি বিখ্যাত ফরাসী লেখক এবং নোবেলজয়ী পন্ডিত রম্যাঁ রল্যাঁ ও মতপ্রকাশ করেছেন যে স্বামী বিবেকানন্দ যা বলে গেছেন, আজও সেই কথা পড়তে পড়তে আমার সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

মাদ্রাজ শহরে প্রদত্ত উপরোক্ত চারটি বক্তৃতাই ছিল স্বামীজীর

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গভীর মনঃসংযম দ্বারা আয়ত্তাধীন জ্ঞান, প্রবল ধী শক্তি দ্বারা আয়ত্তাধীন দূরদৃষ্টি এবং গভীর অর্ন্তদৃষ্টি দ্বারা অর্জিত চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ। স্বামীজীর শিষ্য প্রফেসর সুন্দরম আয়ার তাঁর (স্মারক) স্মরণিকাতে উল্লেখ করেছেন যে ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য, ভারতীয় জাতীয় সত্ত্বার সামগ্রিক জাগরণের জন্য স্বামীজীর বাণী যথার্থ পথনির্দেশক ছিল। শ্রীযুক্ত সুন্দররাম আয়ার আরও উল্লেখ করেছিলেন যে স্বামীজীর চতুর্থ বক্তৃতায় তাঁর বাগ্মিতা ছিল সর্বোত্তম-তিনি মঞ্চের একপ্রান্ত থেকে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত যেন সিংহপ্রায় পাদচারণ করছিলেন। তাঁর নিনাদধ্বনি হলের সর্বত্র প্রসারিত হয়ে অপূর্ব ফলোৎপাদন করছিল। তাঁর একটি মন্তব্য আমি কখনও ভুলতে পারব না, আর তা স্বামীজীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টিশক্তি ও সর্বজ্ঞতারই দ্যোতক ছিল ঃ শান্তি, ধর্ম, ভাষা, গভর্ণমেন্ট- এই সমস্ত মিলেই জাতি গঠিত হয়; কিন্তু তার মধ্যে কোন একটি মাত্রই ভিত্তিস্বরূপ হয়ে থাকে, এবং বাকি সব আমরা তারই উপর গড়ে তুলি। ধর্মই ভারতীয় জীবনের মূল সুর এবং ঐ ভিত্তিতেই ভারতীয় জাতি গড়ে উঠতে পারে।

চতুর্থ ভাষণটি ছাড়াও স্বামীজী ট্রিপলিকেন স্বাক্ষরতা প্রতিষ্ঠানে (Triplicaine Ziterccy Society) তাঁর চিন্তাধারা সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত বক্তৃতা দিয়েছিলেন কারণ স্বামীজীর বিদেশযাত্রায় এবং বিশ্বধর্মমহাসভায় তাঁকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত করতে এই প্রতিষ্ঠানটি সাহায্য করেছিল।

মাদ্রাজ শহরে স্বামীজীর নবরাত্রি

স্বামজী ক্যাসল-কার্ণালে টানা ন'দিন ছিলেন। (6th–14th)। ১৫ ফেব্রুয়ারী সকালে তিনি এস্ এস্ মোমবাসা জাহাজে চড়ে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করলেন। মাদ্রাজ শহরে তাঁর ন'দিন ব্যাপী অবস্থানকে তাঁর এক শিষ্য নবরাত্রি বলে অভিহিত করেছেন, কারণ ঐ ন' দিন ছিল মাদ্রাজ শহরবাসীর জন্য এক পবিত্র সময়। যে সময় তারা স্বামীজীর অন্তরস্থিত পবিত্র জ্ঞানাগ্নির সংস্পর্শে এসে জীবনবোধ সম্পর্কে এক গভীর অণুপ্রেরণা লাভ করেছিল, স্বামীজীর সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও স্থির সঙ্কল্পবদ্ধ অন্তঃকরণ তাদের উজ্জীবিত করেছিল ভবিষ্যতের পথে সঠিক পদক্ষেপে এগিয়ে যাবার জন্য। কলকাতায় স্বামীজীকে অভ্যর্থনা দেওয়ার জন্য অভ্যর্থনা সমিতি গঠন করা হয় ২১ শে জানুয়ারী, ১৮৯৭ সালে, যদিও তিনি ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেছিলেন ২৬ শে জানুয়ারী, ১৮৯৭। কলকাতার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন দ্বারভাঙ্গার মহারাজ এবং সম্পাদক ও সাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে শোভাবাজারের রাজা বিনয় কৃষ্ণ দেব ও বিখ্যাত সাহিত্যিক হীরেন্দ্র নাথ দত্ত। এছাড়া বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এর সভ্য ছিলেন।

১৯ শে ফেব্রুয়ারী, ৯৭ সালে স্বামীজীর কলকাতা আগমণ

এস্ এস্ মোম্বাসা নামক জাহাজটি যথাকালে বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে গঙ্গানদীর মোহনায় প্রবেশ করল এবং ১৮ই ফেব্রুয়ারী বজবজ্ বন্দরে এসে পৌঁছল। পরের দিন সকালে

তাঁকে স্পেশাল ট্রেনে বজবজ থেকে শিয়ালদহ স্টেশনে আনা হয়। ১৯ শে ফেব্রুয়ারী সকাল সাড়ে সাতটায় তিনি শিয়ালদহে এসে পৌঁছেছিলেন।

শিয়ালদা স্টেশনে প্রায় কুড়ি হাজার লোকের এক বিশাল সমাবেশ হয়েছিল। সমগ্র স্থানটি বিজয়তোরণ, পতাকা এবং পুষ্পসজ্জায় অপূর্বভাবে সজ্জিত হয়েছিল। স্বামীজীর অভ্যর্থনাকারীদের মধ্যে ছিলেন 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন। উপস্থিত জনতার গননবিদারী হর্ষধ্বনি ও বিপুল সংবর্ধনায় বিহ্বলচিত্ত স্বামীজী অনেক কষ্টে ট্রেন থেকে নামতে পারলেন। সেভিয়ার দম্পতির সাথে স্বামীজী তাঁর জন্য নির্ধারিত অশ্বযানে উঠলেন, কিন্তু একদল ছাত্র স্বামীজী অশ্বযানে ওঠামাত্র অশ্বযুগলকে মুক্ত করে নিজেরাই গাড়ি টানতে লাগল।

যেহেতু স্বামীজী একসময় রিপণ কলেজের (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) ছাত্র ছিলেন সেইজন্য সেখানে এক ছোট অভ্যর্থনার আয়োজন হয়েছিল। সেখানে ছিল তিনটি সুসজ্জিত তোরণ। আর ছিল বিপুল উৎসাহী জনতা স্বামীজী কলেজে নামলে তাঁকে সাধারণভাবে অভ্যর্থনা জানানো হয়, এবং অভ্যর্থনা সমিতির সদস্যরা স্থির করেন যে সর্বসাধারণের সুবিধার জন্য এক প্রথাগত নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করা হবে শোভাবাজারের রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের বাড়ির বিস্তৃত প্রাঙ্গানে।

১৯ শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনাবলীর কিছু স্মৃতিচারণ

শ্রী কুমুদবন্ধু সেন তাঁর স্মৃতি কথায় লিখেছেন বিদেশ প্রত্যাগত বিশ্ববিশ্রুত সন্ন্যাসীর ভারতে পুনরাগমন এক প্রবল প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল ভারতের জনগণমানসে। সমস্ত সংবাদপত্রগুলি তাঁর সাফল্যের ধারা বিবরণী প্রকাশ করেছিল, সুদূর দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলঙ্কায় তাঁকে যে আবেগপূর্ণ অভ্যর্থনা করা হয়েছিল তা ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিবৃত হয়েছিল। এর পরে শুরু হয়েছিল কলকাতার অভ্যর্থনা সমিতির কার্যাবলী। প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হয়েছিল যে ফেব্রুয়ারীর ভোরবেলা হয়তো কলকাতার পথে খুব বেশি জনসমাগন এই উপলক্ষে হবে না, কিন্তু দেখা গেল শিয়ালদা স্টেশনে স্বামীজীর আগমনের দু'ঘন্টা আগে থেকেই অসংখ্য মানুষ উপস্থিত হয়ে রয়েছেন।

কলকাতায় তাঁকে প্রাথমিক অভ্যর্থনা

রিপণ কলেজ থেকে স্বামীজীকে পশুপতিনাথ ঘোষের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে স্বপার্ষদ স্বামীজী মধ্যাহ্নভোজন করেছিলেন। এখানে তিনজন সম্ভ্রান্ত ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল-এঁরা হলেন বিখ্যাত নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ, শ্রী মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের রচয়িতা এবং বিখ্যাত নাট্যকার শ্রী অমৃতলাল বোস, যিনি রসরাজ নামেও পরিচিত ছিলেন।

এখানে স্বামীজীর আরও দুই গুরুভ্রাতা ছিলেন-তাঁরা হলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল মহারাজ) এবং স্বামী যোগানন্দ। এই সময়েই স্বামীজীর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন স্থাপনের পরিকল্পনা

দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। যাই হোক, কলকাতায় স্বামীজীর আনুষ্ঠানিক নাগরিক সংবর্ধনা হয়েছিল ২৮ শে ফেব্রুয়ারী, শোভাবাজার রাজবাড়িতে।

স্বামীজীর সঙ্গে আগত বিদেশী সঙ্গীদের থাকবার ব্যবস্থা হয়েছিল বরানগরে গোপাললাল শীলের বাগানবাড়িতে।

শোভাবাজার রাজবাড়িতে স্বামীজীর সংবর্ধনা সভায় তিনি যে বক্তৃতা করেছিলেন তার মূল বক্তব্য ছিল-মানুষ নিজের চেষ্টায় মুক্তিলাভের জন্য জগৎ-প্রপঞ্চের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করতে চাইলেও তার অন্তরে একটি ধ্বনি সর্বদাই উচ্চারিত হয় 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।' এর সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের বিরুদ্ধে উভয় দেশে যেসব ভুল ধারণা বর্তমান, তারও উল্লেখ করলেন। তিনি বলেছিলেন-পাশ্চাত্যবাসীরা মনে করে দারিদ্র্য ও ধর্মহীনতা, পরাধীনতা ও আধ্যাত্মিক শক্তি শূণ্যতা একই কথা, পক্ষান্তরে ভারতবাসীরা মনে করে, পাশ্চাত্যবাসীরা ধর্মবিমুখ ও জড়বাদী। কিন্তু হঠাৎ এইরূপ সিদ্ধান্ত করে ফেলা অনুচিত। তিনি বলেছিলেন-ভারতের পুনরুভ্যুত্থানের জন্য যে নতুন শক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। এ কার শক্তি? তারপর নিজেই উত্তর দিলেন-এটি আর কারও শক্তি নয়। যে শক্তি এখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসরূপে আবির্ভূত হয়েছেন, এ সেই শক্তি। এখন আমরা সেই মহাশক্তির খেলার আরম্ভমাত্র দেখছি। আর বর্তমান যুগের অবসান হওয়ার আগেই তোমরা এর আশ্চর্য, অতি আশ্চর্য খেলা প্রত্যক্ষ করবে।

এই সময় থেকেই ধীরে ধীরে আলমবাজার মঠের কার্যাবলী

বিস্তৃততর হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের ভিত্তি স্থাপনের পথ প্রশস্ত হয়। স্বামীজী আলমবাজার মঠে ও গোপাললাল শীলের বাগানে ধর্মালোচনা তো করতেনই, সময়ে সময়ে কলকাতায় গিয়েও বহু ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করতেন।

কলকাতায় স্বামীজীর দ্বিতীয় ভাষণটি হয়েছিল ৪ঠা মার্চ, ১৮৯৭ (4th March) স্টার থিয়েটার। সেই সভাগৃহে উদ্বোধনী বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন 'ইন্ডিয়ান মিরর্' এর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে স্বামীজী আমাদের মাঝে আবির্ভূত হয়েছেন আমাদের ঐতিহ্যগত ধর্ম, সংস্কৃতি এবং আধ্যাত্মিক গৌরবের রক্ষাকর্তা হিসাবে। প্রকৃতপক্ষে এই কথা চরম সত্যি, কারণ স্বামীজী যে বিশ্বাস নিয়ে ভারতীয় জাতীয় জীবনের সার্বিক অগ্রগতির সোপান নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন, সেই বিশ্বাস আজ এক প্রকৃতদ্রষ্টব্য সত্য হয়ে বিরাজ করছে, তাঁর আগমনের ১২৫ বছর পরে (i.e., from 1893–2017)

উত্তর ও পশ্চিম ভারতে স্বামীজী স্বল্পকালব্যাপী অবস্থান

মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় আসার পর স্বামীজীর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না। কাজেই ডাক্তারের পরামর্শমত স্বামীজী ১৮৯৭ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে দার্জিলিং যাওয়া মনস্থ করলেন। বলা হয় যে স্বামীজী দার্জিলিং এ থাকাকালীনই ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ মিশনের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার রূপরেখা স্থির করেছিলেন। দার্জিলিং-এ তাঁর গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী ত্রিগুণাতীত, স্বামী জ্ঞানানন্দ প্রমুখ এবং বিদেশী সাহায্যকারী যথা শ্রীযুক্ত গুডউইন, ডঃ টার্নবুল প্রমুখের সঙ্গে এ ব্যাপারে

বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথাগত উপস্থাপনের ঘোষণা

স্বামীজী কলকাতায় ফিরে আসেন ২৮ শে এপ্রিল। ১ লা মে ১৯৮৭ সালে বাগবাজারে বলরাম বসু মহাশয়ের গৃহে "রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন' এর সূত্রপাত হয়, অর্থাৎ ঐ দিনই তিনি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করে মঠ ও মিশনের পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন।

পশ্চিম ভারত ভ্রমণ

কলকাতায় এক সপ্তাহ থাকার পর ডাক্তারের উপদেশক্রমে স্বামীজী ৮ই মে, ১৮৯৭ সালে আলমোড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

তাঁর পশ্চিম ভারত ভ্রমণ আট মাসব্যাপী ছিল এবং তিনি জানুয়ারী, ১৮৯৮ সালে আলমবাজার মঠে ফিরে আসেন। এই সময় মধ্যে তিনি কেবল আলমোড়ায় থাকেন নি, তিনি বিভিন্ন জায়গা পরিভ্রমণ করে ভাষণ দিয়েছিলেন, যথা-আলমোড়ায় (৩টি ভাষণ), শিয়ালকোর্ট (২টি ভাষণ), লাহোর (৩টি ভাষণ) এবং খেতড়ি (২টি ভাষণ)।

স্বামীজী প্রদত্ত হিন্দি ভাষণ

আলমোড়া এবং শিয়ালকোর্ট-এ স্বামীজী জনগণের আবেদন অণুসারে হিন্দিতে ভাষণ দিয়েছিলেন। তাঁর হিন্দি ভাষণও সমান আকর্ষণীয় ও বাগ্মিতা পূর্ণ ছিল। যেহেতু হিন্দি ভারতীয় উপমহাদেশের এক অন্যতম ভাষামাধ্যম ছিল, তাই স্বামীজী

এই ভাষায় ভাষণ দিয়ে খুবই প্রীত হয়েছিলেন। কারণ এর মাধ্যমে এক বিশাল অংশের জনসমাজকে তিনি তাঁর ভাবধারায় বিষয়ে অবগত করতে পেরেছিলেন।

লাহোরে স্বামীজী প্রদত্ত ভাষণ

লাহোরে স্বামীজী ৩টি ভাষণ দিয়েছিলেন যা সমগ্র লাহোর এলাকায় বিস্তারিতভাবে প্রচারিত হয়েছিল।

শ্রী প্রভু দত্ত শাস্ত্রী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে যদিও তিনি স্বামীজীর শিকাগোতে প্রদত্ত ভাষণ শোনেননি, তবুও লাহোরে প্রদত্ত স্বামীজীর ভাষণও সমান উদ্দীপক ছিল বলে তাঁর মনে হয়।

বিদেশে অবস্থানকালে স্বামীজীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী

ধর্মমহাসভায় যোগদানের পর আমেরিকা এবং ইওরোপে স্বামীজীর অবস্থান

স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম এবং দক্ষিণ আমেরিকায় ভ্রমণ করে ভারতীয় ভাবের প্রচার করে ও ভারত সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাগুলি দূরকরে বিনিময়ে আমেরিকা থেকে অর্থলাভ করবেন এবং এভাবে ভারতে শিল্পাদি উৎপাদনের উপায় প্রবর্তনের দ্বারা ভারতের দারিদ্র্য দূর করবেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি প্রকাশ্যে অর্থ ভিক্ষা করার সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিলেন কারণ তিনি হয়তো ভেবেছিলেন ইহলৌকিক উদ্দেশ্যকে বেশি অণুসরণ করলে শ্রোতার সংখ্যা কমে যাবে, তার ফলে স্বামীজীর

উদ্দেশ্য বিফল হবে। তাঁর এই অভিমত তিনি অধ্যাপক রাইটকে ২৬ অক্টোবর, ১৮৯৩ তারিখে লেখা চিঠিতে জানিয়েছিলেন। স্বামীজী ১৮৯৫ সালের সেপ্টেম্বর -নভেম্বর মাসে ইংলন্ডে গিয়েছিলেন, পরে আবার আমেরিকায় এসে ১৫.৪.১৮৯৬ তারিখ পর্যন্ত এখানে অবস্থান করেছিলেন এবং ১৮৯৬ এর ১৫ই এপ্রিল দ্বিতীয়বার লন্ডন গেলেন।

আমেরিকার কাটানো তিন বছরের মধ্যে বেশিরভাগ সময়টা স্বামীজীর ব্যয়িত হত ভাষণ দিতে এবং বিভিন্ন রকম সামাজিক আলোচনাসভায় অংশগ্রহণ করতে। যে সব জায়গায় স্বামীজী ভাষণ দিতেন তা হল শিকাগো, ডেট্রয়েড, গ্রীণ একর এবং থাউজ্যান্ড আইল্যান্ড পার্ক।

গ্রীণ একরে স্বামীজীর আগমন

মিস্ সারা ফার্মার সঙ্গে নিউ ইয়র্কে এক ধর্মালোচনাসভায় স্বামীজীর দেখা হয়েছিল। তিনি ছিলেন বিখ্যাত শিল্পপতি গেরিশ ফার্মার (Gerrish Farmer) এর কন্যা। এই গেরিশ ফার্মার টমাস আলভা এডিসন আবিষ্কৃত বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বৈদ্যুতিক বাল্ব প্রথম বাজারজাত করেছিলেন। এই বাল্বই শিকাগোর ধর্মমহাসভা আলোকিত করেছিল। যাই হোক মিস্ সারা ফার্মার এর আমন্ত্রণে স্বামীজী গ্রীণ একরে এসেছিলেন।

মিস্ ফার্মার দ্বারা আয়োজিত গ্রীণ একরের আলোচনাসভা

মিস্ ফার্মার এর প্রযত্নে গ্রীণ একরে এক আলোচনাসভা আয়োজিত হয়েছিল যেখানে শিকাগোর মত বিভিন্ন ধর্মমত

সমর্থক দের উপস্তিতিতে স্বামীজী ভাষণ দিয়েছিলেন। ব্রুকলিনের এথিক্যাল কালচারাল সোসাইটির (Ethical Cultural Society) সভাপতি লুইস ই জেমস্ প্রমুখ বিখ্যাত চিন্তাবিদ্ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এই বিভিন্ন ধর্মামতাবলম্বী, বিশেষত: খ্রীষ্টধর্মেরই বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার পরিব্যাপ্ত আপাত বিরোধী মতাবলম্বীদের এই অভূর্তপূর্ব জমায়েত সম্বন্ধে স্বামীজীর মূল্যায়ন পাওয়া যায় ৩১ শে জুলাই, ১৮৯৪ সালে হেল ভগিনীদের উদ্দেশ্যে লিখিত স্বামীজীর এক পত্রে।

ইওরোপে স্বামী বিবেকানন্দ

১৮৯৫ সালে স্বামীজী ইংলন্ড ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, তাঁর নিজেরই ভাষায় 'just to probe a little.১৮৯৫ সালের নভেম্বরের শেষে এলবার্টা স্টারর্জেসকে (Alberta Starges)লেখা তাঁর পত্র থেকে জানা যায় যে তিনি ইংলন্ডকে বেদান্ত প্রচারের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষিত চিন্তাশীল উচ্চবর্ণের মানুষ বারা পরিপূর্ণ মনে করতেন। তিনি বেশ কিছুদিন মিস্টার স্টার্ডি এবং মিস্ হলার এর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।

ইংলন্ডে স্বামীজীর দ্বিতীয়বার আগমন

১৮৯৬ সালের এপ্রিলে স্বামীজী দ্বিতীয়বার লন্ডনে এসেছিলেন। এই সময়কালে তিনি ধারাবাহিকভাবে ক্যাভারশেমে মিস্টার স্টার্ডির বাড়িতে, পিঙ্কিস্ গ্রীণ নামক স্থানে মিস্টার মুলারের বাড়িতে এবং সেন্ট জর্জ রোডে

মিসেস্ ইসাবেল মারগেসন (Lady Isabel Margesson)এর বাড়িতে ছিলেন। মিসেস্ মারগেসন্ এর বাড়িতে ১৮৯৫ সালের নভেম্বরের এক শীতল সন্ধ্যায় স্বামীজীর এক বক্তৃতাসভার আয়োজন করা হয়েছিল। মিস্ মার্গারেট নোবল্ (পরবর্তীকালের ভগিনী নিবেদিতা) সেখানে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। মিস্ মার্গারেট নোবল্ সেই প্রথমবার এই বিশ্ববিশ্রুত সন্ন্যাসীর অতুলনীয় ঐশ্বরিক সৌন্দর্য্য, দৃঢ়, ঋজু ব্যক্তিত্বশালী অথচ শিশুর সরলতা মন্ডিত এক বুদ্ধিদীপ্ত উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করলেন এবং গভীরভাবে অণুপ্রাণিত হলেন। মিস্ নোবল্ সেদিন স্বামীজীর সব কথা বুঝতে পারেন নি, কিন্তু এটুকু বুঝেছিলেন যে তিনি এর আগে ধর্মবিষয়ে যে ভাষণ শুনেছেন। স্বামীজীর বক্তব্য তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই ভিন্ন জগতের বার্তা মিস্ মার্গারেটকে এমনভাবে স্পর্শ করেছিল যে এর ফলে তাঁর জীবনে এক আমূল পরিবর্তন এসেছিল, এবং লন্ডনের প্রতিভাশালিনী এই শিক্ষিকা অচিরেই ব্রহ্মচারিণী ভগিনী নিবেদিতা হয়ে ভারতের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

লন্ডনেই স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর আজীবন বিশ্বস্ত শ্রুতিলেখক জে. জে. গডউইনের সাক্ষাৎ হয়েছিল। প্রসঙ্গত গডউইন মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে ভারতের মাটিতে দেহত্যাগ করেছিলেন। যাই হোক, ইংলন্ডেই স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর এক গুরুভ্রাতা এবং ছোট ভাই মহেন্দ্রলাল দত্তের দেখা হয়েছিল।

লন্ডনে স্বামীজীকে প্রতি সপ্তাহে চারটি করে নিয়মিত ক্লাস এবং একটি প্রশ্নোত্তর ক্লাস নিতে হত। তাছাড়া বিকেলবেলা

তিনি সমাগত অতিথিদের সঙ্গে বেদান্ত আলোচনায় সময় অতিবাহিত করতেন। এই সময়কালে তাঁর লিখিত 'রাজযোগ' এর প্রকাশনার কার্যাবলীও চলছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, প্রধানত: লস্ অ্যাঞ্জেলেস্ এ প্রদত্ত ভাষণগুলিই 'রাজযোগ' নামে গ্রন্থ হিসাবে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল।

লন্ডনে সিসেম ক্লাস- এখানে অবশ্য উল্লেখ্য যে লন্ডনেই স্বামীজী মিস্টার এরিক হ্যামন্ড এবং মিসেস নেল হ্যামন্ড এর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এখানকার আলোচনাসভাগুলিতেই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল যে স্বামীজী কেবল ধর্মবিষয়েই পান্ডিত্য অর্জন করেন নি, বিশ্বের ইতিহাস এবং আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতও তাঁর খুব ভালভাবে জানা ছিল।

স্বামীজীর লন্ডনে অবস্থান, কার্যাবলী এবং বক্তৃতার কথা স্মরণ করে এরিক হ্যামন্ড লিখেছিলেন-স্বামীজী যখন প্রথম ইংলন্ডে আসেন তখন জনসাধারণ কিছুটা দ্বিধাপূর্ণ এবং সংশয়াচ্ছন্ন ভাবে তাঁকে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর চিত্তাকর্ষক ব্যক্তিত্ব এরই মধ্যে পথ করে নিয়েছিল এবং বহু হৃদয়ের সংবর্ধনালাভে সমর্থ হয়েছিল। বিভিন্ন দলীয় শিক্ষার্থী বৃন্দ নানা অঞ্চলে সমবেত হত এবং নির্দিষ্ট সময়ে তাঁর বক্তৃতা শুনত। শ্রোতারা একবার শুনে আবার শুনতে চাইত। সিসেম ক্লাব নামক এক মহিলা সমিতিতে তিনি শিক্ষাবিষয়ে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতায় তিনি ভারতের প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতির উল্লেখ করে বলেছিলেন ঐ পদ্ধতির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মানুষ গঠন করা, শুধু পাঠ মুখস্থ করা নয়।

সিসেম ক্লাসের সাফল্যের পর স্বামীজীর নিয়মিত ক্লাসগুলিও

চালু হল। সেখানে শ্রোতাদের উপস্থিতির হার ক্রমেই বাড়তে থাকল। মিস্টার এইচ্ আর হার্ডইস্ যিনি অ্যাংকিলান চার্চের, এক নেতা ছিলেন, স্বামীজীর বক্তৃতাসভায় এসে তৎক্ষণাৎ অণুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তৎকালীন রাণীর বাড়িতে মিসেস্ হাউইস্ এক আলোচনাসভা ডেকেছিলেন। সেই আলোচনাসভায় অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যথা অ্যালবানির ডাচেস্, (কুইন্ ভিক্টোরিয়ার ছোট ছেলের বিধবা) জন গলসওয়ার্দি (John Galsworthy) এবং মিসেস্ হাউইস্ মিস্টার এরিক হ্যামন্ড, মিস্ মার্গারেট নোবল্ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত:, মিস্ মার্গারেট নোবল্‌ই ছিলেন পরবর্তীকালের ভগিনী নিবেদিতা।

স্বামীজী তাঁর বক্তৃতাসভার মাধ্যমে অনেক জগদ্বিখ্যাত ব্যক্তি যথা জর্জ বার্নাড্‌শ, সিডনী, স্যার বার্ট্রানড রাসেল প্রমুখের সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তাঁরা মতামত ব্যক্ত করেছিলেন যে বেদান্ত থেকে তাঁরা তাঁদের নিজেদের আদর্শের স্বপক্ষে এক জোরালো সমর্থন পেয়েছেন।

সুইজারল্যান্ডে স্বামী বিবেকানন্দ-১৮৯৬ সালের গ্রীষ্মকালে স্বামীজী সুইজারল্যান্ড ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণকাল ছিল নয় সপ্তাহব্যাপী। তিনজন ইংরেজ শিষ্য এই যাত্রাপথে তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। তাঁরা হলেন ক্যাপ্টেন সেভিয়ার এবং তাঁর পত্নী মিসেস্ সেভিয়ার ও মিস্ হেনরিয়েটা মিলার। স্বামীজী 'সাস্ ফ্রি' নামক স্থানে অবস্থান করেছিলেন। তিনি তাঁর সুইজারল্যান্ডে ভ্রমণে এতই প্রীত হয়েছিলেন যে তিনি লিখেছিলেন সুইজারল্যান্ড হচ্ছে হিমালয়ের ছোট সংস্করণ,

বা সমস্ত পার্থিব অনুভূতি এবং জাগতিক বন্ধন থেকে মানবমনকে মুক্ত করে। তিনি সুইজারল্যান্ড ভ্রমণ করে অবিস্মরণীয় আনন্দ লাভ করেছেন এবং যে উচ্চাবস্থায় তাঁর মনকে নিয়ে যেতে পেরেছেন তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলা সংবাদপত্র

স্বামীজী আমেরিকাতে দেখেছিলেন সংবাদপত্রের অসীম ক্ষমতা, এক অচেনা সন্ন্যাসীকে শিক্ষিত আমেরিকানদের কাছে পরিচিত করেছিল সংবাদপত্র। ২০ শে সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্মমহাসভায় স্বামীজী যে বক্তৃতা দেন তার বিষয় ছিল 'Religion not the crying need of India.' এই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন ভারতের মানুষের আত্মার উন্নতির জন্য মিশনারিদের পাঠানো হয়। কিন্তু ভারতে পূর্ব থেকেই অনেক ধর্ম আছে, ওখানে ধর্মের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন রুটির গরিব মানুষ রুটি চায়, আমরা বিনিময়ে পাথরের নুড়ি উপহার দিই। স্বামীজীর যুক্তি ও আবেগ মিশ্রিত বক্তৃতা ছুঁয়ে যায় শ্রোতাদের মন। এই খবরের ভিত্তিতে মিশনারিরা চটে যায়, কারণ এর ভিত্তিতে বহু দাতা মিশনারিদের দান বন্ধ করার হুমকি দেয়। সে অন্য প্রসঙ্গ। কিন্তু সংবাদপত্রের এই শক্তি, জনমানসে তার প্রভাব স্বামীজী উপলব্ধি করেন।

অত:পর শিকাগো ধর্মমহাসভায় সাফল্যের এক বছর পরে ১৮৯৪-এ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত এক দীর্ঘ পত্রে স্বামী বিবেকানন্দ একটি সংবাদপত্র প্রকাশের ইচ্ছা তাঁর গুরুভাইদের জানান। এই চিঠিতে স্বামীজী লিখেছেন-"একটা খবরের কাগজ

তোমাদের edit করতে হবে, আদ্দেক বাংলা, আদ্দেক হিন্দী, পারো তো আর একটা ইংরেজীতে। পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছ, -খবরের কাগজের Subscriber সংগ্রহ করতে কদিন লাগে?...."

শুধু এটিই নয়, পাশ্চাত্য থেকে লেখা বহু চিঠিতে কাগজ করার তাগাদা রয়েছে। কারণ তিনি বুঝেছিলেন বিশাল জনমানসে সংবাদপত্রের মাধ্যমেই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করা যায়। ভারতের মানুষের শিক্ষা ও সৃজনশীলতাকে সংবাদপত্রের মাধ্যমেই সর্বাপেক্ষা ভালভাবে ভারতীয় সমাজে প্রচার করা যাবে এবং মিশনারিদের অযৌক্তিক আক্রমণ ও অন্যায্য ব্যবহারকেও প্রতিহত করা যাবে একমাত্র ভারতীয়দের নিজেদের স্বপক্ষে যুক্তিগুলির একটি document থাকলে। ১৮৯৬ সালে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে লেখা চিঠিতে তিনি তাদের দৈনিক প্রভাতী সংবাদপত্র প্রকাশের পরিকল্পনাকে উৎসাহ জানিয়ে ৫০০ টাকা পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

মনে রাখতে হবে স্বামীজী যখন এ চিঠি লিখছেন তখন ইংল্যান্ড এবং আমেরিকাতে এক শ্রেণীর মিশনারি নাগাড়ে তাঁর নামে কুৎসা রটিয়ে চলেছে। ১৮৯৪ এবং ১৮৯৫ সালে স্বামীজী বারবার তাঁর গুরুভাইদের paper clipping এবং cutting পাঠাতে অনুরোধ করেছেন যাতে ভারতের মানুষ বিবেকানন্দকে নিয়ে কি ভাবছেন বোঝা যায়। পরে অবশ্য যত দিন গেছে স্বামীজীর সমালোচকরা চুপ করে গেছেন।

যাই হোক, ভারতে ফিরে আসার পরে স্বামীজী স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দকে নানাভাবে উৎসাহিত করতে লাগলেন একটি

অন্তত: মাসিক পত্রিকা প্রকাশের জন্য। এরই মধ্যে ১৮৯৭ সালের ১ লা মে প্রতিষ্ঠিত হল রামকৃষ্ণ মিশন। সেবার মধ্য দিয়ে যে সব স্তরের মানুষের কাছে পৌঁছন যায় স্বামজী তা দেখিয়ে দিলেন। বন্যা বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মিশনের সন্ন্যাসীরা সেবাকাজ পরিচালনার এক অনন্য নজির গড়লেন। অবশেষে ১৮৯৯ সালের জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি উদ্বোধন প্রকাশিত হল। স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ছিলেন উদ্বোধনের প্রথম সম্পাদক। প্রথম প্রকাশ পাক্ষিক রূপ। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল উদ্বোধনকে দৈনিক করার, কিন্তু অর্থাভাবে তা করা যায় নি। উদ্বোধন প্রকাশের সময় স্বামীজী ১০০০ টাকা দিয়েছিলেন, আর ১০০০ টাকা ধার করেছিলেন বন্ধু হরমোহন মিত্রের কাছ থেকে। তার জন্য প্রতিমাসে সুদ গুণতে হত। সংবাদপত্র প্রকাশর জন্য সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী টাকা ধার করেছেন এ দৃষ্টান্ত বিরল। কিন্তু স্বামীজী তা করেছিলেন কারণ তিনি জানতেন এই পত্রিকার ইতিবাচক চিন্তার মাধ্যমে সমগ্র দেশকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হবে। উদ্বোধনের প্রথম অফিস-'কলিকাতা, কম্বুলটোলা, ১৪ নং রামচন্দ্র মৈত্র লেন, গিরীন্দ্রমোহন বসাকের বাড়িতে।' স্বামীজী উদ্বোধনের প্রথম প্রস্তাবনাটি লিখেছিলেন এবং তা থেকে আমরা জানতে পারি "পুব-পশ্চিমের মিলন হবে উদ্বোধনের জীবনোদ্দেশ্য।" স্বামীজীর দেহত্যাগের সাত বছর পর ১৯০৯ সালে ভারতী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ স্বামীজীর এই বিশেষ গুণটির কথা স্মরণ করে লিখেছিলেন-"ভারতের সাধনাকে পশ্চিমে ও পশ্চিমের সাধনা ভারতে দিবার ও লইবার পথ রচনা করিতে গিয়া তিনি নিজের জীবনকে

উৎসর্গ করিয়াছিলেন।"

স্বামী বিবেকানন্দ এবং ভারতীয় ভাবধারায় রূপান্তরিতা ভগিনী নিবেদিতা

একথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে ১৮৯৪ সালে লন্ডনে মিসেস্ মারগেসন্ নামে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রমহিলার বাড়িতে স্বামীজীর বক্তৃতাসভায় তৎকালীন লন্ডনের এক প্রতিভাশালিনী স্কুলশিক্ষিকা তথা বিদ্যানুরাগী, আত্মানুসন্ধানী এবং গভীর অনুভূতিসম্পন্না মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্ প্রথম স্বামীজীকে দেখেছিলেন এবং সেই প্রথম সাক্ষাতেই এই দৃপ্ত সন্ন্যাসীর ধর্মবিষয়ের উদাত্ত বাণীতে খুঁজে পেয়েছিলেন এমন এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ, যা কিনা এ পর্যন্ত তিনি অন্য কোন ধর্মপ্রবক্তা বা প্রচারকের বাণী অথবা ধর্মবিষয়ের বইতে পাননি। তিনি স্বামীজীর আরও কয়েকটি বক্তৃতাসভা এবং প্রশ্নোত্তর ক্লাসে উপস্থিত হয়ে তাঁর মনের প্রশ্নসমূহ উপস্থাপিত করেছিলেন এবং শেষপর্যন্ত স্বামীজীকে তাঁর গুরুরূপে স্বীকার করেছিলেন। স্বামীজীও মার্গারেটের সত্যবাদিতা, দয়ালু অন্তরসত্তা এবং লক্ষ্যে অবিচল থাকার দৃঢ়তা দেখে তৃপ্ত হয়েছিলেন।

স্বামীজীর কোমল হৃদয়বত্তা সর্বদাই তাঁর স্বদেশের দুর্দশামোচনের জন্য হৃদয়বত্তা উদ্‌গ্রীব থাকত। তিনি অনুভব করতেন যে বিদেশী শক্তি দ্বারা পদদলিত ভারতের গণজাগরণ ঘটাতে গেলে সাধারণ জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। আর যেহেতু জনগণের একটা বড় অংশই হল নারী, সেহেতু

নারী শিক্ষা ভারতবর্ষে অতীব প্রয়োজনীয়। শিক্ষার মাধ্যমে নারীগণ স্বাবলম্বী হয়ে আত্মবিশ্বাস অর্জন করবে এবং নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারবে। তাঁর এই কাজে সহায়তা করার জন্য তিনি মিস্ মার্গারেটের সহায়তা চেয়েছিলেন।

স্বামীজী মিস্ মার্গারেটকে দুটি চিঠি লিখেছিলেন। একটি হল ১৮৯৬ সালের ৭ই জুন (7th July, 1896) লন্ডনের সেন্ট জর্জ রোডে মিস্ মার্গেসন্ এর বাড়ি থেকে এবং অপরটি ১৮৯৭ সালের ২৯ জুলাই (29 th July, 1897) আলমোড়া থেকে। এই দুটি চিঠিরই প্রতিলিপি এখানে উদ্ধৃত হল।

Two Letters

63, ST. GEORGE'S ROAD, LONDON
7th June, 1896

DEAR MISS NOBLE,

My ideal indeed can be put into a few words and that is : to preach unto mankind their divinity, and how to make it manifest in every movement of life.

This world is in chains of superstition. I pity the oppressed, whether man or woman, and I pity more the oppressors.

One idea that I see clear as daylight is that misery is caused by ignorance and nothing else. Who will give the world light? Sacrifice in the past has been the Law, it will be, alas, for ages to come. The earth's bravest and best will have to sacrifice themselves for the good of many, for the welfare of all. Budddhas by

the hundred are necessary with eternal love and pity.

Religions of the world have become lifeless mockeries. What the world wants is character. The world is in need for those whose life is one buring love, selfless. That love will make every word tell like thunderbolt.

It is no superstition with you, I am sure, you have the making in you of a world-mover, and others will also come. Bold words and bolder deeds are what we want. Awake, awake, great ones! The world is buring with misery. Can you sleep? Let us call and call till the sleeping gods awake, till the god within answers to the call. What more is in life? What greater work? The details come to me as I go. I never make plans. Plans grow and work themselves. I only say, awake, awake!

May all blessings attend you for ever!

yours affectionately,
VIVEKANANDA
ALMORA,
29th July, 1897

MY DEAR MISS NOBLE,

Let me tell you frankly that I am now convinced that you have a great future in the work for India. What was wanted was not a man, but a woman; a real lioness, to work for the Indians, women specially.

India cannot yet produce great women, she must borrow them from other nations. Your education, sincerity, purity, immense love, determination, and above all, the celtic blood make you just the woman wanted.

Yet the difficulties are many. You cannot form any idea of the misery, the superstition, and the slavery that are here. You will be in the midst of a mass of half–naked men and women with quaint ideas of caste and isolation, shunning the white skin through fear or hatred and hated by them intensely. On the other hand, you will be looked upon by the white as a crank, and every one of your movements will be watched with suspicion.

Then the climate is fearfully hot; our winter in most places being like your summer, and in the south it is always blazing. Not one European comfort is to be had in places out of the cities. If, in spite of all this, you dare venture into the work, you are welcome, a hundred times welcome. As for me, I am nobody here as elsewhere, but what little influence I have, shall be devoted to your service.

You must think well before you plange in, and after work, if you fail in this or get disgusted, on my part I promise you, I will stand by you unto death whether you work for India or not, whether you give up Vedanta or remain in it. 'The tusks of the elephant come out, but never go back', so are the words of

a man never retracted. I promise you that. Again, I must give you a bit of worning. You must stand on your own feet and not be under the wings of Miss Muller or anybody else. Miss Muller is a good lady in her own way, but unfortunately it got into her head, when she was a girl, that she was a born leader and that no other qualifications were necessary to move the world but money!....

Mrs. Sevier is a jewel of a lady, so good, so kind, The seviers are the only English people who do not hate the natives, Sturdy not excepted Mr. and Mrs. Sevier are the only persons who did not come to patronise us, but they have no fixed plans yet. When you come, you may get them to work with you, and that will be really helpful to them and to you. But after all, it is absolutely necessary to stand on one's own feet...

yours ever in the Lord
VIVEKANANDA.

মার্গারেট তাঁর স্বদেশভূমি, বন্ধু-আত্মীয়স্বজন, প্রতিষ্ঠিত জীবনের হাতছানি সমস্ত কিছুকে উপেক্ষা করে ২৮ জানুয়ারী ১৮৯৮ সালে জাহাজে করে কলকাতায় এসে পৌঁছলেন স্বামীজীর কাজে সাহায্য করার জন্য। সর্বপ্রথম দরকার ছিল তাঁর পক্ষে ভারতকে জানা, ভারতীয় ভাবধারা অনুসরণ করা। সেই উদ্দেশ্য স্বামীজী তাঁকে দিনের পর দিন ভারতের ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, সাধারণ মানুষের জীবন এবং সামাজিক

রীতিনীতির সঙ্গো পরিচিত হতে সাহায্য করেছিলেন। অত:পর নিবেদিতা ভারতীয় চিন্তা, ও ধারণাদি বিষয়ে গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেন এবং এক অপ্রতিহত টান অনুভব করলেন ভারতীয় জীবন গ্রহণ করার। ধীরে ধীরে, ভারত ও নিবেদিতা এক হয়ে গেলেন। স্বামীজীর ভারতের চিরন্তন বাণী, যা বিশ্বমানবের ও প্রাণের কথা, তাই গ্রহণ করে ভারতের কল্যাণার্থে নিবেদিতা তাঁর জীবনকে উৎসর্গ করলন। নিবেদিতা পরম করুণাময়ী শ্রীশ্রী সারদা মার স্নেহ ও সান্নিধ্য ও পেয়েছিলেন। (২৫ শে মার্চ, ১৯৮৯) কিছুদিনের মধ্যেই স্বামীজী তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রহ্মচারিণীরূপে অভিষিক্ত করে তাঁর নতুন নাম দিলেন 'নিবেদিতা'। এরপর থেকে তাঁর কাজ হল শুধুই ভারতের সেবা। তিনি ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনে এক বালিকা বিদ্যালয়ে স্থাপন করে তার পরিচালনভার নিজস্কন্ধে নিয়েছিলেন। স্বামীজী প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারার মিলনভূমিতে দাঁড়িয়ে যে সকল ভাব প্রকাশ করেছিলেন, সমস্যা সমাধানের যে সব নবীন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন, তা তখনকার মত পাশ্চাত্য শিষ্যদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হলেও সৌভাগ্যবশত নিবেদিতার লেখনী দ্বারা তা সংরক্ষিত হয়ে ভারত ও বিশ্বের কাছে আজ এক চিরকালীন সম্পদরূপে বিবেচিত হয়। স্বামীজীকে ভালভাবে বুঝতে হলে তাঁর রচনা, চিঠিপত্র ও উপদেশাবলীর সঙ্গো নিবেদিতার গ্রন্থরাজিও অবশ্য পাঠ করতে হবে। নিবেদিতার লিখিত কয়েকটি গ্রন্থ হল 'The master as I saw him', 'Kali the Mother,' 'The web of Indian Life', 'Cradl tales of Hinduism.'

"আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ"

স্বামীজী গুরুভ্রাতাদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'। অর্থাৎ নিজের মুক্তি এবং জগতের হিত-এই দুই-ই মানবজীবনের লক্ষ্য। অর্থাৎ এ জগৎ সংসারে যে নিত্য সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ সদা বিরাজমান, তার সন্ধান পেতে হলে শুধুমাত্র নিজমুক্তির সাধনে জগৎ থেকে মুখ ফিরিয়ে সাধনায় রত হলেই হবে না, আবার শুধুমাত্র এই অনিত্য জগৎ সংসারের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা-লোভ-লালসায় নিমজ্জিত থাকলেও সেই অনন্ত অনিত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে না। জগতে সর্বপরিব্যাপ্ত সেই সদাজাগ্রত অনন্ত চেতনা জীবকূলরূপে প্রতিভাত আছেন, তাই শিবজ্ঞানে জীবসেবা করে, নিষ্কাম কর্মের মাধ্যমে নিজ আত্মার অব্যক্ত ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করতে হবে। আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য। স্বামীজী বলেছিলেন 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত,'-ওঠ, জাগ, নিজ জেগে অপর সকলকে জাগ্রত কর, নরজন্ম সার্থক করে চলে যাও। প্রকৃতপক্ষে স্বামীজী যে বেদান্তের বাণী জগৎসভায় বিশ্বমানবের কল্যাণার্থে প্রচার করেছিলেন, তা সনাতন হিন্দুধর্মের মূল ভিত্তি বেদ বা বেদেরই অন্তভুক্ত উপনিষদসমূহ। স্বামীজী ধরাধামে মানসরূপ পরিগ্রহ করে এই বাণী জগৎসমক্ষে প্রচার না করলেও তা উপনিষদে লিপিবদ্ধ থাকত, কিন্তু তিনি যা করেছিলেন তা হল উপনিষদ অবলম্বনে ভারতের ধর্মসমূহের মধ্যে সমন্বয়সাধন

এবং শুধুমাত্র ভারত নয় সমস্ত বিশ্বধর্মের মধ্যে সমন্বয়সাধন। উপনিষদ বলছেন-হে মানব, তেজস্বী হও, দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। উপনিষদ দেখিয়ে দেয়, যে মুক্তি সর্বধর্মেই সর্বজীবের চরম লক্ষ্য, যে শাশ্বত অপরিবর্তনীয় সত্ত্বার কথা সমস্ত ধর্মেই স্বীকৃত, সেই মুক্ত সত্ত্বা পূর্ব থেকেই মানুষের মধ্যে বিরাজমান। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই দেবত্ব বর্তমান। স্বামীজী দেখিয়ে ছিলেন। এই তত্ত্বের স্বীকৃতি ও প্রয়োগের ফলে সমাজ ব্যবস্থায় বহু বাঞ্ছনীয় পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। স্বামীজী বলেছিলেন, আমাদের উপনিষদ থেকে আর একটি মহান উপদেশ লাভ করার জন্য সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা করছে-সমগ্র জগতের অখন্ডত্ব। আমরা সকলেই সেই সর্বব্যাপী পরমচেতনার সঙ্গে একীভূত। এই আপাত পরিবর্তনশীল জগতের জীবকুল, জাতি, দেশের বিভিন্নতা কেবল নাম ও রূপের ভেদ, প্রকৃতপক্ষে সকলই ব্রহ্মস্বরূপ। স্বামীজী স্বদেশপ্রেমিক হলেও বিশ্বপ্রেম বা বিশ্বের সঙ্গে আদান-প্রদান বাদ দিয়ে ভারত তার পৃথক নিরপেক্ষ সত্ত্বা বজায় রাখতে পারে বর্তমান যুগে এমন অসম্ভব কথা বিশ্বাস করতেন না। "রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও যে সকল সমস্যা বিশ বৎসর পূর্বে শুধু জাতীয় সমস্যা ছিল। এখন আর জাতীয় ভিত্তিতে সেগুলির সমাধান করা যায় না। আন্তর্জাতিক ভিত্তিরূপ প্রশস্ততর ভূমি থেকেই শুধু তাদের মীমাংসা করা যেতে পারে।" এই উদ্দেশ্যে উপনিষদ নির্দেশিত সকল জীবকুলের একত্বভাবের প্রসার ও প্রচার প্রয়োজনীয় বলে আজ আমরা উপলব্ধি করতে পেরেছি। স্বামীজীর পূর্বে আর

কেউ এই কথাগুলি এত স্পষ্টভাবে বলেন নি। স্বামীজী দেখিয়ে দিয়েছিলেন, নীতিশাস্ত্রের সমস্যাবলীর মীমাংসা এবং তার যুক্তিসঙ্গত ভিত্তিভূমির সন্ধান ও একমাত্র উপনিষদেই লক্ষ্য। এই বক্তব্যই হল স্বামীজীর 'কার্যে পরিণত বেদান্ত' বা 'ভারতীয় জীবনে বেদান্তের কার্যকারিতা।'

স্বামীজীর দৃষ্টিতে ভারতীয় জাতীয় একতা

স্বামীজী ভারতীয় ইতিহাস বা সমাজব্যবস্থা সম্পর্কেও যথেষ্ট আগ্রহশীল ছিলেন। ভারতীয় সভ্যতার ঐক্য কোথায়, শ্রীরামচন্দ্র থেকে সম্রাট আকবর পর্যন্ত ভারতসন্তানগণ কিভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির পুষ্টিসাধন করেছেন ইত্যাদি বিষয়ের বিচারে তিনি দিনের পর দিন নিরত থাকতেন। ভারতীয় বীরাঙ্গনা ঝাঁসির রাণী তাঁর নিকট প্রচুর সম্মান পেতেন। স্বদেশের কল্যাণ-সাধন তাঁর জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। স্বামীজীর বক্তৃতা, আলোচনা এবং গ্রন্থসমূহে ভারতীয় জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য তিনি যে মহামানবগণের মত ও পথকে অবশ্য অণুসরণীয় মনে করেছিলেন তাঁরা হলেন-

(1) মর্যাদা পুরুষোত্তমরূপে ভগবান রামচন্দ্র

(2) লীলা পুরুষোত্তমরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

(3) প্রজ্ঞা পুরুষোত্তমরূপে ভগবান বুদ্ধ

(4) প্রেম পুরুষোত্তমরূপে ভগবান শ্রীচৈতন্য

(5) সমন্বয় পুরুষোত্তমরূপে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামীজী ছিলেন যুগাচার্য-বর্তমান যুগের মানবমাত্রের কল্যাণ পথের নির্দেশক। ব্যক্তিগত মুক্তিপ্রাপ্তির উৎকর্ষ প্রমাণ করা

তাঁর একমাত্র কর্তব্য ছিল না। যুগবাণী উচ্চারিত হয়েছিল তাঁর উদাত্ত আহ্বানে, আর সে বাণী রূপায়িত হয়েছিল তাঁর সবল ব্যক্তিত্ব অবলম্বনে। স্বামীজীর আদর্শে একটি মহতী বাণী সুস্পষ্ট হয়েছে, তা হল ভারতের কার্যপন্থা রচিত হয়ে গিয়েছে-ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে। স্বামীজীর সমকালে ভারতীয় সন্ন্যাসীবৃন্দ ত্যাগের মহিমাই বিঘোষিত করতেন, স্বামীজী এই প্রচারের সঙ্গে সেবাকেও সংযোজিত করতে চেয়েছিলেন। ধর্মকে তিনি জাতির মর্মস্থলে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত দেখতে চেয়েছিলেন, আর চেয়েছিলেন শিক্ষার বিস্তার, নীচজাতির অভ্যুত্থান ও দারিদ্র্যবিমোচন।

আজ একবিংশ শতাব্দীর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে ভারতবর্ষ। বিশ্বায়ণের অধিপত্যে আজ শুধুমাত্র ভারতীয় সমাজ নয়, বিশ্বমানবসমাজ, বিশ্ব-রাজনীতি, ও আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি একই ধারায়, একই অনুষঙ্গে জড়বাদকে অবলম্বন করে ভোগবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিজ শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণে একে অপরকে পর্যুদস্ত করে পার্থিব লক্ষ্যপূরণের এক অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগীতায় সামিল হয়েছে। ধর্মে ধর্মে বিভেদ, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে ঘৃণা ও অবিশ্বাস আজ জন্ম দিয়েছে সন্ত্রাসবাদের তাই আজকের এই পরিস্থিতিতে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ, উপনিষদ প্রসূত অদ্বৈতবেদান্তের মতবাদই একমাত্র সেই শাশ্বত আলোকবর্তিকা যা সমাগত সমস্যাসঙ্কুল মানবজীবনে শান্তির সন্ধান দিতে পারে, একতার বীজ বপন করতে পারে, মানুষ মানুষে ঘৃণা অপসারিত করে পারস্পরিক সহাবস্থানের মাধ্যমে এক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে

সাহায্য করতে পারে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এবং করুণাময়ী শ্রী শ্রী সারদা মার আশীর্ব্বাদ ধন্য এই পরার্থে উৎসর্গিতপ্রাণ সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ভাবনা ও আদর্শকে পাথেয় করে সমগ্র ভারত তথা বিশ্বমানবসমাজ এগিয়ে চলুক উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ গঠনের লক্ষ্যে এই কামনাতেই পৃথিবীর কর্মভূমিতে স্বামীজীর দৃপ্ত পদক্ষেপ পুনর্বার অবলোকনের এই প্রয়াস।



ডাঃ জে. সি পাল

লেখক পরিচিতি —

ডাঃ জে. সি. পালের জন্ম হয় অধুনা বাংলাদেশের ঢাকা জেলার ১৯৩৪ সালে এবং তাঁর প্রাতমিক শিক্ষা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানে এবং ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলায়, যা কিনা বর্তমান ভারতীয় উপমহাদেশের অন্তর্গত। আগরতলায় থাকাকালীন তিনি শ্রী রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে দীক্ষিত হন স্বামী দয়ালানন্দজী নামে রামকৃষ্ণ সাধনা কুটীরের এক স্বামীজির সংস্পর্শে ১৯৪৮ সালে। তিনি ১৯৫৮ সালে ধাত্রীবিদ্যায় সাম্মানিক সহ এম.বি.বি.এস. পাশ করেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধাত্রীবিদ্যায় এম.এস করেন। তিনি ইংল্যান্ডের রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস্-এ ১৯৬৩ সালে ফেলো হিসাবে যোগ দেন। তিনি শল্য চিকিৎসক হিসাবে সাড়ে তিন দশক কাজ করেন এবং শল্য চিকিৎসা বিদ্যায় বিভাগীয় প্রধান হিসাবে আর.জি. কর মেডিকেল কলেজ থেকে অবসর নেন। তিনি শল্যচিকিৎসা বিদ্যায় এম.বি.বি.এস. এবং এম.এস. পাঠক্রমের কয়েকটি বই লেখেন যা ইংল্যান্ডের রয়্যাল কলেজ অফ সার্জনস্ দ্বারা প্রশংসিত।